ইতিহাস এবং নাগরিক শাস্ত্র

সপ্তম শ্রেনী

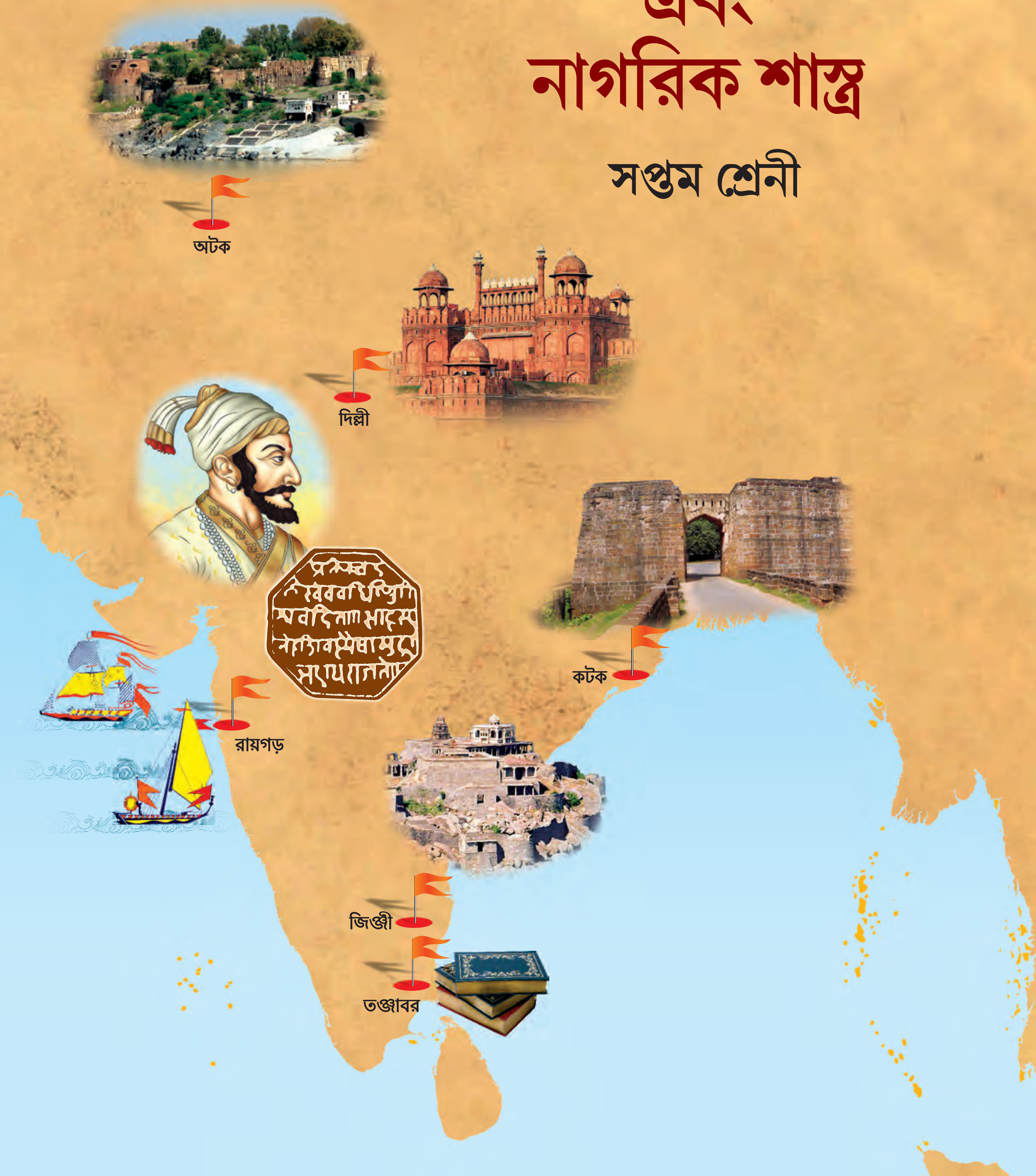

ভারতের সংবিধান

ভাগ 4 ক

মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহৃত হলে সাড়া দিতে হবে ;

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে ;

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে;

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে ;

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে;

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বযসেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস-২১১৬/(প্র.ক্র.৪৩/১৬) এসডী-৪ তারিখ ২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ ২৯.৪.২০২২ এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক সন ২০২২-২৩ এই শৈক্ষণিক বর্ষ থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে ।

ইতিহাস এবং নাগরিক শাস্ত্র

সপ্তম শ্রেনী

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুনে,

Z7P7Z7

আপনার স্মার্টফোনে DIKSHA APP দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার Q.R Code এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠের সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃক শ্রাব্য সাহিত্য উপলব্ধ হবে!

প্রথমাবৃত্তি: ২০২২

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুনে-৪১১০০৪.
এই বইয়ের সম্পূর্ন অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডলের অধিনে সুরক্ষিত থাকবে, এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ সঞ্চালক মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া প্রকাশিত করা যাবে না।

ইতিহাস বিষয় সমিতি

ডা. সদানন্দ মোরে, অধ্যক্ষ
শ্রী মোহন শেটে, সদস্য
শ্রী পান্ডুরং বলকবডে, সদস্য
ডা. অভিরাম দিক্ষিত, সদস্য
শ্রী বাপুসাহেব শিন্দে, সদস্য
শ্রী বালকৃষ্ণ চোপড়ে, সদস্য
শ্রী প্রশান্ত সরুডকর, সদস্য
শ্রী মোগল জাধব, সদস্য-সচিব

নাগরিকশাস্ত্র বিষয় সমিতি

ডা. শ্রীকান্ত পরাংজপে অধ্যক্ষ
প্রা. সাধনা কুলকর্নী, সদস্য
ডা. মোহন কাশীকর, সদস্য
শ্রী বৈজনাথ কালে, সদস্য
শ্রী মোগল জাধব, সদস্য-সচিব

ইতিহাস ও নাগরিক শাস্ত্র অভ্যাসগট

শ্রী রাহুল প্রভু
শ্রী সজ্ঞয় বঝরেকর
শ্রী সুভাস রাঠোর
শ্রীমতী সুনিতা দড়বী
ডা. শিবানী লিময়ে
শ্রী ভাওসাহেব উমাটে
ডা. নাগনাথ এওলে
শ্রী সদানন্দ ডোঙ্গরে
শ্রী রবিদ্র পাটিল
শ্রী বিক্রম অডসুল
শ্রীমতী রুপালী গিরকর
ডা. মিনাক্ষী উপাধ্যায়
শ্রীমতী কাঞ্চন কেতকর
শ্রীমতী শিবকন্যা পটবে
ডা. অনিল সিংগারে
ডা. রাওসাহেব শেড়কে
শী মরীবা চন্দনশিবে
শ্রী সন্তোষ শিন্দে
ডা. সতিশ চাপলে
শ্রী বিশাল কুলকর্নী
শ্রী শেখর পাটিল
শ্রী সজ্ঞয় মেহতা
শ্রী রামদাস ঠাকর
ডা. অজিত আপটে
ডা. মোহন খডসে
শ্রীমতী শিবকন্যা কদেরকর
শ্রী গৌতম ডাঙ্গে
ডা. বেঙ্কটেশ খরাত
শ্রী রবিন্দ্র জিন্দে
ডা. প্রভাকর লোন্ডে

আমন্ত্রিত

ডা. সোমনাথ রোডে,
ডা. গনেশ রাউত

মুলপৃষ্ঠ ও সাজসজ্জা

শ্রী দেবদত্ত প্রকাশ বলকবডে

দুর্গের ছায়াচিত্র (ছবি) শ্রী প্রবিন ভোসলে

মানচিত্রকার

শ্রী রবিকিরন জাধব

ভাষান্তরকার

শ্রী অশিমকুমার বিশ্বাস
শ্রী মহাদেব দে

সমীক্ষক

শ্রী অমর বিশ্বাস
শ্রী জগদীশ মল্লিক

বিষয়তজ্ঞ

শ্রী বিজয় মল্লিক
শ্রী নারায়ন মল্লিক

ভাষান্তর সংয়োজন

ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী,
পাঠ্যপুস্তক মন্ডল, পুনে

সংয়োজন সহায়ক

সৌ. সন্ধা বি. উপাসনী
সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী,
পাঠ্যপুস্তক মন্ডল, পুনে

অক্ষর বিন্যাস

মুদ্রা বিভাগ,
পাঠ্যপুস্তক মন্ডল, পুনে

কাগজ

৭০জী. এস. এম. ক্রিমবোহ্ন

মুদ্রনাদেশ

N/PB/2022-23/Qty.1,000

মুদ্রক

M/s. Uchitha Graphics Printers Pvt. Ltd., Navi Mumbai

সংয়োজক

শ্রী মোগল জাধব
বিশেষাধিকারী, ইতিহাস ও
নাগরিক শাস্ত্র
শ্রীমতী বর্ষা সরোদে
বিষয় সহায়ক, ইতিহাস ও নাগরিক শাস্ত্র পাঠ্যপুস্তক
মন্ডল, পুনে।

নির্মিতি

শ্রী সচিন মেহতা,
মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী শশাঙ্ক কণিকদড়ে
নির্মিতি অধিকারী

প্রকাশক

শ্রী বিবেক উত্তম গোসাবী নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মন্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বই-২৫

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

''আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,

বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম

এবং উপাসনার স্বাধীনতা,

সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন

ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা

এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য

ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে

তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।''

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

প্রস্তাবনা

ছাত্র বন্ধুরা,

তোমরা তৃতীয় শ্রেনী থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত ইতিহাস ও নাগরিক শাস্ত্র বিষয়ের অধ্যয়ন ‘পরিসর অভ্যাস ভাগ-১’ এবং ‘পরিসর অভ্যাস ভাগ-২’ এর মধ্যে করেছো, ষষ্ঠ শ্রেনী থেকে অভ্যাসক্রমে ইতিহাস ও নাগরিক শাস্ত্র স্বতন্ত্র বিষয় রয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেনী থেকে এই দুইটি বিষয়ের সমাবেশ একটি পাঠ্যপুস্তকে করা হয়েছে। মরাঠী পাঠ্যপুস্তকের নির্মিতী বর্ষ ২০১৭ তে করা হয়েছে। বাংলা ভাষিক শিক্ষার্থীদের আবশ্যকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সপ্তম শ্রেনীর জন্য বাংলা ভাষায় ইতিহাস ও নাগরিক শাস্ত্র পাঠ্যপুস্তকটি প্রথম আবৃত্তি করা হয়েছে। সপ্তম শ্রেনীর পাঠ্যপুস্তকটি তোমাদের হাতে তুলে দিতে আমাদের আনন্দ অনুভব হচ্ছে।

এই বিষয় সঠিক ভাবে বোঝা, আকর্ষনিয় অনুভব হওয়া, আমাদের পূর্বপুরুষ দ্বারা করা কার্য থেকে অনুপ্রেরনা পাওয়া, এই উদ্দেশ্য রেখে পাঠ্যপুস্তকের রচনা করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দ প্রাপ্ত হবে; আমরা এইরূপ অনুভব করি। এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকে রঙ্গীন চিত্র ও মানচিত্র দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের প্রত্যেক পাঠ লক্ষ্যপূর্বক অধ্যয়ন করো। এর থেকে যে অংশ তোমরা বুঝতে না পারবে, তাহা শিক্ষক, অভিভাবক দ্বারা বুঝে নেবে। চৌখটে দেওয়া তথ্য তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করবে। ইতিহাস আকর্ষক বিষয় ও এটা আমাদের বন্ধু এইরূপ ভাবনা রেখে যদি এই পুস্তকের অধ্যয়ন করো তাহলে ইতিহাসের প্রতি অবশ্যই তোমাদের রুচি তৈরি হবে।

ইতিহাসের অংশে মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। মধ্যযুগীয় ভারতের নির্মানে মহারাষ্ট্রর স্থান ও ভূমিকা কে কেন্দ্র স্থানে রেখে পাঠ্যপুস্তকের রচনা করা হয়েছে। এর থেকে তোমাদের এই কথার জ্ঞান হওয়াও অপেক্ষিত যে আমরা ভারতের নাগরিক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কিছু কর্তব্য পালন করাও প্রয়োজন।

নাগরিকশাস্ত্রের অংশে ভারতীয় সংবিধানের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের সংবিধান গড়ার পার্শ্বভূমি, সংবিধানের উদ্দেশিকা এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও নীতি নির্দেশিত সিদ্ধান্তগুলী প্রস্তুত করা হয়েছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র সংবিধান আইন এবং বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা সহজ ভাষায় বলা হয়েছে। তোমাদের অধ্যয়ন অধিকাধিক কৃতিপ্রধান হওয়ার জন্য উপক্রম দেওয়া হয়েছে। আমরা দেশের ভবিষ্যতের নাগরিক ও আমরা দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবো; এই পরিকল্পনা নিয়েই তোমরা পরবর্তী শ্রেনীতে প্রবেশ করবে।

ইতিহাস অধ্যয়ন দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষদের পরাক্রম ও বীরত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। যদি এটি নাগরিক অধ্যয়নের সাহায্য পায়, তাহলে আমরা এটাও বুঝতে পারবো যে দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ গড়ার দৃষ্টিতে আমাদের কর্তব্য কি। এর জন্য এটি একটি যৌথ অধ্যয়নের উপক্রম।

(শ্রী বিবেক উত্তম গোসাবী)
সঞ্চালক
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম
সংশোধন মন্ডল, পুনে

পুনে

তারিখ : ৭ অক্টোবর ২০২১

ভারতীয় সৌর:১৫ আশ্বিন ১৯৪৩

-শিক্ষকদের জন্য-

ষষ্ঠ শ্রেনীর ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক আমরা অবশ্যই অধ্যপন কার্য করেছি। সপ্তম শ্রেনীর পাঠ্যপুস্তকে মধ্যযুগীন ভারতের ইতিহাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইতিহাসের এই উপস্থাপনার বৈশিষ্ট এই যে এই উপস্থাপনা মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে। যদিও আমাদের প্রদেশ (অঞ্চল) ভারতীয় সংঘরাজ্যের একটি অংশ তবুও ইতিহাস মূল্যায়ন করার সময় মহারাষ্ট্রের দৃষ্টি থেকে ভারতের ইতিহাসে মহারাষ্ট্রের স্থান, ভূমিকা এবং মহারাষ্ট্রের অবদান কে সামনে রেখে বোঝার জন্য চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীদের জাতীয় ভাবনা আরও পরিপক্ক হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সত্তিকারে রাষ্ট্রের জন্য কি করেছে; তাহার জ্ঞান হবে এবং এর দ্বারা আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ আরও বেশি বিকশিত হবে।

এই প্রসঙ্গে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ দ্বারা স্থাপিত *স্বরাজ্য* স্বাভাবিকভারে মহত্বপূর্ন প্রমানিত হয়। *স্বরাজ্য* নির্মান বুঝাতে হলে শিবাজী মহারাজের উদয়ের পূর্বর ভারত ও মহারাষ্ট্রের প্রচলিত পরিস্থিতির মূল্যায়ন্‌ করতে হবে। অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসের মূল্যায়ন করতে হবে। এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে পুস্তকটির রচনা করা হয়েছে। শিবাজী মহারাজের দ্বারা স্থাপিত *স্বরাজ্য* শিবাজী মহারাজের মৃত্যুর পর উত্তর থেকে যে আক্রমনগুলি হয়েছিল তার মুকাবিলা মহারাষ্ট্র, কিভাবে করেছে এবং কিভাবে আমাদের স্বরাজ্যের রক্ষা করেছে; ইহার বিচার বিমর্শ করা হয়েছে। এই আক্রমনগুলিকে বিফল করার পর মারাঠারা মহারাষ্ট্রের সীমা বিস্তার করেছে এবং অধিকাংশ ভারত ব্যাপ্ত করে নিয়েছিলো। স্বরাজ্যের সাম্রাজ্যে রূপান্তরনের বিবেচনা; এটি তার পরবর্তি অংশ। ইংরেজরা ভারতে বিজয় লাভ করেছে এবং এখানে শাসনও করেছে এটা সকলেই জানে; কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ইংরেজদের প্রতিরোধ করতে মহারাষ্ট্র কিরুপ অগ্রসর ছিল, এটা বুঝে নেওয়া ততোটাই মহত্বপূর্ণ। ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দিতা মারাঠাদের সঙ্গে ছিল এবং তারা ভারতের উপর বিজয় লাভ করেছিল কিন্তু তার জন্য তাদের মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ করতে হয়েছে। এটাই আমাদের সামর্থ্য ও কর্তব্যবোধের সচেতনতা। অতএব অধ্যয়ন- অধ্যপন করার সময় এই ভাব ছাত্রদের মনে অঙ্কিত হওয়া অপেক্ষিত। পাঠ্যপুস্তকের এই দৃষ্টিকোন (ভূমিকা) চিত্ররূপে মুখপৃষ্ঠে ব্যক্ত করা হয়েছে। এবং মুখপৃষ্ঠে মারাঠি সাম্রাজ্যের বিস্তার দেখানোর জন্য ভারতের স্থুল মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে।

নাগরিকশাস্ত্রের অংশে ভারতীয় সংবিধানের পরিচয় করানো হয়েছে। এই বিষয়টিকে এক শৈক্ষনিক বৎসরে পড়ানো সম্ভব নয়। অতএব এই বিষয়টিকে দুই শ্রেণীতে বিভাজিত করা হয়েছে। এই শ্রেণীতে সংবিধানের প্রয়োজন, সংবিধানে উল্লেখিত মূল্য, উদ্দেশিকা, মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য এবং নীতি নির্দেশক সিদ্ধান্তের উপর ভর দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে উল্লেখিত শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ এবং তার উপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অধ্যয়ন অষ্টম শ্রেনীতে করব। এই দৃষ্টিতে সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেনীর নাগরিকশাস্ত্রের বিষয়বস্তু একে অপরের পরিপূরক। ছাত্ররা যাতে বিষয়বস্তু ভালভাবে মূল্যায়ন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়ের পরিবেশন করা হয়েছে। বিষয়বস্তু নাবিন্যপূর্ন ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। যদিও এটি জ্ঞানরচনাবাদী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল, তবু এছাড়াও রাজকীয় ব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা দূর করে, ছাত্রদের সমাজের অঙ্গ তৈরি করায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আশয়ের বিন্যাস সহজ-সরল ভাষায় করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের পঠনিয়তা বৃদ্ধিতে এটি সহায়ক হবে।

শিক্ষক এই পাঠ্যপুস্তকটি পড়ানোর সময় সংবাদপত্র, দুরদর্শনের সংবাদ, বিষয়তজ্ঞ দ্বারা ব্যবহৃত বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের ব্যবহার করবে ছাত্রদের মধ্যে সমগ্র দৃষ্টিকোনের বিকাশ করতে সাহায্য করবে। ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্রের’ অধ্যয়ন-অধ্যপন যদি বর্তমান ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে করা হয় তাহলে তাহা অধিক অর্থপূর্ণ/কার্যসিদ্ধী হবেই এছাড়াও ছাত্রদের মূল্য আত্মসাৎ করতে তার সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়।

অনুক্রমনিকা

মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস

ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা ক্র.
১.	ইতিহাসের সাধন	১
২.	শিবপূর্বকালিন ভারত	৫
৩.	ধার্মিক সমন্বয়	১১
৪.	শিবপূর্বকালিন মহারাষ্ট্র	১৪
৫.	*স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠা	১৯
৬.	মোগলদের সাথে দ্বন্দ্ব	২৪
৭.	*স্বরাজ্যের* প্রশাসন	২৯
৮.	আদর্শ শাসক	৩৩
৯.	মারাঠাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম	৩৭
১০.	মরাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার	৪৪
১১.	রাষ্ট্ররক্ষক মারাঠা	৪৭
১২.	সাম্রাজ্যের প্রগতি	৫৩
১৩.	মহারাষ্ট্রের সামাজিক জীবন	৫৭

S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2017. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

অধ্যয়ন নিষ্পত্তি

নির্দেশিত শিক্ষাগত প্রক্রিয়া	অধ্যয়ন নিষ্পত্তি
শিক্ষার্থীদের জোড়ায়/উপদলে/ব্যক্তিগতরূপে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া এবং তাদের নিম্ন কথার জন্য প্রেরিত করা।	**শিক্ষার্থী**
• বই ও স্থানিক পরিসরে উপলব্ধ ঐতিহাসিক সাধন, উদা. পাণ্ডুলিপি মানচিত্র/ব্যাখ্যা/চিত্র (ছবি)/ঐতিহাসিক স্থাপত্য/সিনেমা/চরিত্রের উপর নাটক/দূরদর্শন ধারাবাহিক, লোকশিল্প/নাটক চেনা ও তার তৎকালিন সময়ের ইতিহাস বুঝে নেওয়ার জন্য প্রসঙ্গ অনুসার অর্থ বসানো। • সেই সময়ের গৃহস্থ্য/রাজবংশের উদয়ের (উত্থানের) সাথে পরিচিত হওয়া এবং সেই সময়কালের গুরুত্বপূর্ন ঘটনা সম্পর্কে কালরেখার ভিত্তিতে তথ্য প্রাপ্ত করা। • প্রদত্ত সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্তিত্বের নাট্যকরণ/উপস্থাপনা করা। উদা. সম্রাট অকবর, ছত্রপতী শিবাজী মহারাজ, বাজীরাও প্রথম মহারানী তারাবাই ইত্যাদি। • মধ্যযুগীন সময়কালে সমাজে যে পরিবর্তনগুলি ঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা ও বর্তমান সময়কালের সমাজের সঙ্গে তুলনা করা। • প্রকল্প/ঘরানা/রাজ্য/প্রশাসনিক উন্নতি নির্দিষ্ট সময়কালের স্থাপত্য বৈশিষ্ট। উদা. ভোসলে, শিন্দে, হোলকর ইত্যাদির উপর প্রকল্প (পরিয়োজনা) তৈরি করা। • সাধুদের অভংগ, ভজন, কীর্তন, কাওয়ালীর মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারা জেনে নেওয়া। নিকটবর্তী পরিবারের দরগা, গুরুদ্বয়ার, মন্দির যা ভক্তির সঞ্চার। সুফি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে, তাদের তথ্য প্রাপ্ত করা ও বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের উপর আলোচনা করা। • শিবাজীর পূর্বের ভারত, শিবাজীর পূর্বের মহারাষ্ট্র, স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম পেশওয়া আমলে এবং মরাঠি শক্তির বিস্তার এই বিষয় তথ্য প্রাপ্ত করা।	07.73H.01 ইতিহাসের বিভিন্ন সাধন চেনে এবং বর্তমান সময়ের ইতিহাস পুনর্লিখনের জন্য তাদের ব্যবহার ব্যাখ্যা করে। 07.73H.02 ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালের অধ্যয়ন করার জন্য উপযুক্ত সাধনের উদাহরন প্রস্তুত করে। 07.73H.03 মারাঠা ও মুঘলদের দ্বন্দ্ব চিকিৎসক ভাবে অধ্যয়ন করে। 07.73H.04 শিবাজীর রাজ্যভিষেকের কারন ব্যাখ্যা করে। 07.73H.05 মধ্যযুগীন কালে এক স্থানে ঘটিত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ অন্য স্থানে ঘটিত ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে। 07.73H.06 মধ্যযুগীন কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণ করে। 07.73H.07 ছত্রপতী শিবাজী মহারাজ দ্বারা লষ্করী নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহারিত প্রশাসনিক পথ ও কৌশল বিশ্লেষণ করে। 07.73H.08 মন্দিরের স্থাপত্য, সমাধি, মসজিদের শৈলী ও কৌশলের বিকাশ উদাহরন দ্বারা ব্যাখ্যা করে। 07.73H.09 সাধুদের শিক্ষার মধ্যে, সাদৃশ্য চেনে। 07.73H.10 ভক্তি আন্দোলন ও সুখি সম্প্রদায়ের কবিতা, অভংগ থেকে বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির সিদ্ধান্ত বের করে। 07.73H.11 পানিপথের যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করে। 07.73H.12 মারাঠী শক্তি অখিল ভারতীয় স্তরে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় ইহা তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করে।

১. ইতিহাসের সাধন

গত বছর আমরা ভারতের প্রাচীন যুগের অধ্যয়ন করেছি। এই বছর আমরা মধ্যযুগীন সময়কালের অধ্যয়ন করব ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ মোটামুটি খ্রীষ্ট. পূর্ব নবম শতাব্দী থেকে অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মানা হয়। এই পাঠে আমরা মধ্যযুগীন ইতিহাসের সাধনের অধ্যয়ন করব।

অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির কালানুক্রম অনুযায়ী প্রশাসনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রদত্ত তথ্যকে ইতিহাস বলা হয়।

তুমি জানো কি?

ইতিহাস শব্দ 'ইতি+হা+আস' দ্বারা গঠিত। এই শব্দের অর্থ হল এটা ঘটছে।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে ব্যক্তি, সমাজ ও সময় এই চারটি উপাদান অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য প্রমানের ভিত্তিতে ইতিহাস তৈরি হওয়া প্রয়োজন। এই প্রমানগুলিকে ইতিহাসের সাধন বলা হয়।

আমরা এই সাধনগুলিকে ভৌতিক সাধন, লিখিত সাধন এবং মৌখিক সাধনে শ্রেণীবিন্যাস করে এর বিষয়ে তথ্য প্রাপ্ত করবো। এবং ইতিহাসের এই সাধনগুলির অধ্যয়ন করবো। এবং ইতিহাসের সাধনগুলির মূল্যয়ন করবো।

যে ঐতিহাসিক ঘটনার অধ্যয়ন করতে হয় তার সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক উপাদানের চিন্তন করতে হয়। এর জন্য ঐতিহাসিক সাধনের আধার নেওয়া হয়। এই সাধনগুলির তদন্ত করা প্রয়োজন।এগুলির প্রমানিকতা ও সত্যতার যাচাই করতে হয়।

এই উপাদানগুলির ব্যবহার অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির দ্বারা করা প্রয়োজন।

ভৌতিক সাধন

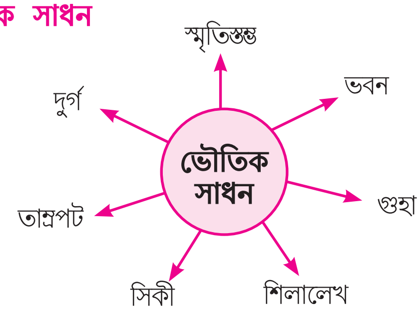

উপরের বস্তু এবং স্থাপত্য অথবা তাদের অবশিষ্টকে ইতিহাসের 'ভৌতিক সাধন' বলা হয়।

ভৌতিক সাধনে দূর্গের একটি মহত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। দুর্গের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকার যেমন - গিরিদুর্গ, বনদুর্গ, জলদুর্গ ও ভুইকোট। এইরূপ স্মৃতিস্তম্বে সমাধি, কবর, খোদাই করা ছোট শিলালেখ (বীরগাল) এবং ভবন মধ্যে রাজবাড়া, মন্ত্রীনিবাস, রানিবাস ও সাধারণ মানুষের বাড়ি ইত্যাদির সমাবেশ হয়।

স্থাপত্যশিল্পে হওয়া উন্নয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। ওই সময়ের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের গুণমাণ, নির্মানকার্যের কৌশল প্রাপ্ত হয়।

বলো দেখি!

সিকী/মুদ্রা দ্বারা ইতিহাসের তথ্য কিভাবে পাওয়া যায়?

বুঝে নেবো?

প্রাচীন সময় থেকে *কৌড়ি, দমড়ী, ধেলা, পাই, পয়সা, আনা, টাকা* এই *সিকী* প্রচলনে ছিল। সিকীর থেকে কিছু প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হয়েছে। উদা;

* 'এক *কানা* কড়িও দেবো না।'
* 'পাই পাইয়ের হিসাব রাখা।'
* 'ষোল আনা সত্য!'।
* 'চামর যায় যাক কিন্তু পয়সা না যায়'।

খোদাই করা ছোট শিলালেখ (বীরগল)

বিভিন্ন শাসক দ্বারা সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি ধাতু ব্যবহার করে তৈরী করা মুদ্রাকে ইতিহাসের মহত্বপুর্ন ধন মানা হয়। মুদ্রার ভিত্তিতে শাসক কে ছিল, তার কার্যকাল, তার শাসন ব্যবস্থা, ধার্মিক ভাবনা, ব্যক্তিগতো বিবরন ইত্যাদির তথ্য প্রাপ্ত হয়। সেই সাথেই আর্থিক ব্যবহার ও আর্থিক স্থিতির জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ওই সময়কালের ধাতুবিদ্যার উন্নতি বোঝা যায় । সম্রাট অকবরের মুদ্রায় অঙ্কিত রাম-সিতার চিত্র/ছবি বা হৈদর অলীর মুদ্রায় অঙ্কিত শিব-পার্বতীর চিত্রের ভিত্তিতে ওই সময়ের প্রচলিত ধার্মিক সমন্বয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। পেশওয়াদের মুদ্রায় আরবী কিম্বা ফারসী ভাষার ব্যবহার করা হতো। এর থেকে তৎকালীন সময় ব্যবহারিত ভাষার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

পেশওয়াকালীন মুদ্রা/সিকী

হৈদর অলীর মুদ্রা

পাথর কিম্বা দেওয়ালে খোদাই করা লিখনকে শিলালেখ বলা হয়। উদা. তঞ্জোরের বৃহদেশ্বর মন্দির পরিসরে খোদাই করা শিলালেখ, চালুক্য, রাষ্ট্রকুট, চোল ও যাদব শাসকদের সময়ে খোদাই করা অনেক শিলালেখ প্রাপ্ত হয়েছে। শিলালেখকে ইতিহাস লেখনের অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসনীয় প্রমান বলে মানা হয়।

এর দ্বারা ভাষা, লিপি, সামাজিক জীবন ইত্যাদি উপাদানগুলি বুঝতে সাহায্য হয়। তামার পাত্রে খোদাই করা শিলালেখকে তাম্রপট বলা হয়। তাম্রপটে রাজাদের আদেশ ও নির্ণয় এইরূপ তথ্য খোদাই করা থাকে।

তুমি জানো কি?

চৈত্য, বিহার, মন্দির, গির্জাঘর, মসজিদ, অগিয়ারী, দরগা, সমাধি গুরুদ্বার, ছাতা, শিল্প, কুয়া, বারবা, মিনার, গাবকুস, অস্ত্র, পাত্র, গয়না, বস্ত্র, শিল্পকলার বস্তু, খেলনা, হাতিয়ার বাদ্যযন্ত্র এই সকল বস্তুগুলি ইতিহাসের ভৌতিক সাধন।

লিখিত সাধন: তৎকালীন সময়ের দেবনাগরী, আরবী, ফারসী, মোড়ী ইত্যাদি লিপির শৈলী, বিভিন্ন ভাষার রূপ, ভোজপত্র, পুথি, গ্রন্থ, আদেশপত্র, চরিত্র, চিত্র দ্বারা আমরা মধ্যযুগের মহত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির তথ্য প্রাপ্ত করতে পারি। তারই সাথে বিভিন্ন ব্যঞ্জন, লোকজীবন, বেশভূষা, আচার বিচার, উৎসবের তথ্য প্রাপ্ত হয়।

এই সকল সাহিত্যকে ইতিহাসের ‘লিখিত সাধন’ বলা হয়।

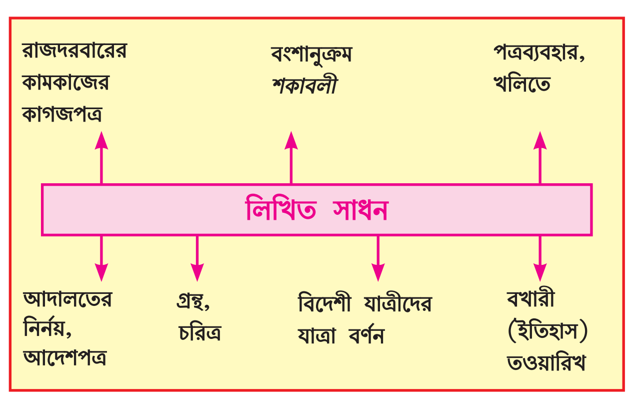

এই সময় বিদেশি যাত্রীরা ভারতে এসেছিল। তাহারা নিজ-নিজ যাত্রা বর্ণনা লিখে রেখেছে। তার মধ্যে অল্বেরুনী, ইব্ন বতুতা, নিকোলস মনুচী ইত্যাদির সমাবেশ হয়। বাবরের চরিত্র, কবি পরমানন্দ দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিবচরিত্র 'শ্রীশিবভারত' এবং বিভিন্ন শাসকদের চরিত্র এবং পত্রব্যবহারের ভিত্তিতে আমরা তৎকালীন শাসকদের নীতি প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধ বুঝতে পারি।

তওয়ারীখ অর্থাৎ তারিখের অর্থ ঘটনাক্রম অথবা ইতিহাস হয়। অল্বেরুনী, জিয়াউদ্দীন বরনী, মৌলানা অহমদ, যাহ্য়া - বিন অহমদ, মির্জা, হৈদর, ভীমসেন সক্সেনা এনাদের দ্বারা লিখিত তওয়ারীখ উপলব্ধ আছে।

বখর শব্দ খবর শব্দ থেকে তৈরী হয়েছে। খবরের অর্থ সমাচার মহারাষ্ট্রে বখর ইতিহাস লেখনের একটি প্রকার বখর দ্বারা তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাগুলি, ভাষা ব্যবহার, সাংস্কৃতিক জীবন, সামাজিক স্থিতি ইত্যাদি উপাদানগুলি বুঝতে সাহায্য হয়। মরাঠীতে অনেক বখর ঘটনা ঘটিত হয়ে যাওয়ার কিছু বৎসর পর লেখন করা হয়েছে। সুতরাং ইহাতে অনেক বার কাল্পনিক তথ্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এটি নিদর্শনে আসে। মহিকাবতীর বখর, সভাসদ বখর, এক্যাধর কলমী বখর, চিটনিসের বখর, ভাউ সাহেবের বখর খর্ডা যুদ্ধের বখর ইত্যাদি কিছু বখর রয়েছে। রাবর্ট আর্ম, এম. সী. স্প্রেংগল এবং গ্রান্ট ডফ এই সমকালীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের গ্রন্থও মহত্বপূর্ন।

করে দেখ

- পোবাড়ে, আদিবাসী গানের সংগ্রহ কর।
- বিদ্যালযে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তার উপস্থাপনা করো।

মৌখিক সাধনঃ লোকপরম্পরায় প্রজন্মগত ভাবে সংক্রমিত হতে থাকা বিয়া (ঢেকির গান), লোকসঙ্গীত, পোবাড়ে, গল্প, কিংবদন্তি, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি দ্বারা আমরা লোকজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র বুঝতে পারি। এই সাধনগুলিকে ইতিহাসের মৌখিক সাধন বলা হয়।

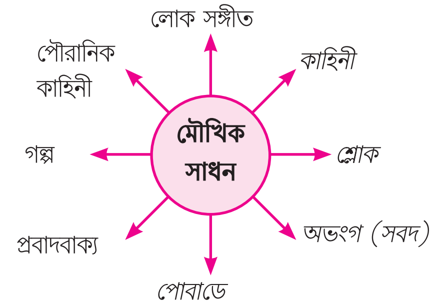

উপরের তিনো প্রকারের সাধনের উপর ভিত্তিকরে ইতিহাস লেখন করা হয়। যদিও ইতিহাস একই বার লেখা হয়, তবুও উক্ত বিষয়ের সম্বন্ধিত অনুসন্ধান ও খোজকার্য অনবরত চলতে থাকে। এই অনুসন্ধান ও খোঁজকার্য দ্বারা নতুন সাধন, নতুন তথ্যের প্রকাশ পাওয়া যায়। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস পুনর্লেখন করা লাগে। যেমন মা-বাবার সময়ের ইতিহাস ও আমাদের সময়ের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে কিছু মাত্রায় পার্থক্য দেখা যায়।

তুমি জনো কি ?

তানাজীর পোবাড়াঃ এই পোবাড়া রচয়িতা তুলশীদাশ শাহীর, উক্ত পোবাড়ে সিংহগড় অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায় । এই পোবাড়ে তানাজী, শেলার মামা, শিবাজী মহারাজ।, বীরমাতা জিজাবাইয়ের সুন্দর স্বভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই পোবাড়ার কিছু অংশ এখানে দেওয়া হয়েছে।

মামা বোলায়া তো লাগলা । এন্সী বর্ষীচা মাতারা।।
"লগিন রাহিলে রায়বাচে তো মজলা সাঙ্গাবী।।
মাঝা তানাজী সুভেদারা । যে গেলে সিংহগড়ালা।।
ত্যাচে পাঠিরে পাহিলে । নাহী পুঢারে পাহিলে।।
জ্ঞানে আম্বারে খাইলা । বাঠা বুজরা লাবিলা।।
ত্যাচে ঝাড হোউনি আম্বে বান্ধলে।
কিল্লা হাতী নাহী আলা।।
সিংহগড কিল্লাচী বার্তা ।
কাঢু নকো তানাজী সুভেদারা।।
যে গেলে সিংহগড়ালা । তে মরুনশানী গেলে।।
তুমচা সপাটা হোইল । অসে বোলু নকো রে মামা।।
আম্হী সুরমর্দ ক্ষত্রী। নাহী ভিনার মরনালা।।"

বলা উচিৎ!

ঐতিহাসিক সাধনের সংরক্ষণের উপায় প্রতিপাদিত কর

ঐতিহাসিক সাধনের মূল্যায়ন: এই সকল সাধন ব্যবহার করার পূর্বে কিছু সতর্কতা রাখা প্রয়োজন হয়। ওই সাধনগুলির বিশ্বাস যোগ্যতা তদন্ত করতে হয়। এর থেকে আসল সাধন কোনগুলি ও নকল সাধন কোনগুলি এর সন্ধান/খোঁজ করতে হয়। অভ্যন্তরীন প্রমান তদন্ত করে এই সাধন -গুলির শ্রেণী নির্ধারন করা হয়। লেখকদের সত্য-মিথ্যা, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, সময়কাল রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদির অধ্যয়ন করা প্রয়োজন হয়। নির্দেশিত তথ্য সে নিজে দেখেছে না, কারো কাছ থেকে শুনে-মিলে লিখেছে ইহারও বিষেষ মহত্ব থাকে। লেখনে ব্যবহৃত অতিরঞ্জন প্রতিমা, প্রতীক, অলঙ্কার ইদ্যাদিরও বিবেচনা করতে হয়। অনন্য সমকালীন সাধনের সঙ্গে ওই তথ্যগুলির তুলনা করে দেখা লাগে। প্রাপ্ত তথ্য একতরফা, অসামঞ্জস্যপূর্ন কিম্বা অতিরঞ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা অস্বিকার করা যাবে না। অতএব ইহার ব্যবহার করার সময় সমান্তরাল রাখা লাগে। নিয়মিত পরিক্ষনের সহিত এই সাধনগুলির ব্যবহার করার দক্ষতা নেওয়া প্রয়োজন হয়। ইতিহাস লেখনে লেখকের ন্যায্যতা ও নিরপেক্ষতার অসাধারণ মহত্ব থাকে।

অনুশীলনী

১. নিম্ন চৌখটে লুকিয়ে থাকা ঐতিহাসিক সাধনের নাম খোঁজ করে লেখো।

তা	দ	ন্ত	ক	থা	র্চ
রী	ম্র	চি	শে	রি	চ
খ	ক	প	ডে	লো	খ
তা	জ্ঞা	শ্লো	ট	ক	লি
আ	পো	বা	ডে	গী	তে
শি	লা	লি	পি	ত	র

২. লেখন করো।

(১) স্থাপত্যে কোন কোন জিনিসের সমাবেশ হয়?

(২) তওয়ারীকের অর্থ কি?

(৩) ইতিহাস লেখনে লেখকের কোন গুণগুলিকে মহত্বপূর্ন মানা হয়?

৩. সমূহের থেকে আলাদা শব্দ খোঁজ করে লেখ

(১) ভৌতিক সাধন, লিখিত সাধন, অলিখিত সাধন, মৌলিক সাধন

(২) স্থাপত্য, মুদ্রা, গুফা, গল্প

(৩) *ভোজপত্র, মন্দির, গ্রন্থ, চিত্র*

(৪) অভংগ (সবদ), তওয়ারীখ,গল্প, পৌরানিক কাহিনী

৪. ধারণাগুলি ব্যখ্যা কর।

(১) ভৌতিক সাধন

(২) লিখিত সাধন

(৩) মৌখিক সাধন

৫. ঐতিহাসিক সাধনের মুল্যায়ন করা প্রয়োজন হয় কি? এ বিষয় তোমার নিজের মত ব্যাক্ত কর।

৬. তোমার নিজের মতামত লেখ।

(১) শিলালেখ কে ইতিহাস লেখনের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ মানা হয়।

(২) মৌখিক সাধন দ্বারা লোকজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র বোঝা যায়।

উপক্রম

নিকটের যে কোন বস্তুসংগ্রহালয় যাও। যে সময়কালের ইতিহাস তোমরা অধ্যয়ন করছো? সেই সময়ের ইতিহাসের সাধনের তথ্য প্রাপ্ত করো এবং উপক্রম খাতায় লেখ।

২. শিবপূর্বকালিন ভারত

এই পাঠে আমরা শিবপূর্বকালিন ভারতের বিভিন্ন রাজতন্ত্রের অধ্যয়ন করব। এই সময়কালে ভারতে বিভিন্ন রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল।

অষ্টম শতাব্দীর 'পাল' বাংলার একটি বিখ্যাত রাজবংশ ছিল। মধ্যভারতে গুর্জার-প্রতিহার শাসকগন অন্ধ্রা, কলিঙ্গা, বিদর্ভ, পশ্চিম কাঠিয়াওয়াড়, কার্ণোজ এবং গুজরাট পর্যন্ত তার রাজত্ব বিস্তৃত করেছিল।

উত্তর ভারতের রাজপুতবংশের মধ্য গাহড়য়াল রাজবংশ এবং পরমার রাজবংশ গুরুত্বপূর্ন ছিল। রাজপুতদের মধ্যে চৌহান রাজবংশের পৃথ্বীরাজ চৌহান ছিলেন একজন শক্তিশালী রাজা। তরাইয়ের প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ চৌহান মুহম্মদ ঘোরিকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরি পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করেন।

তামিলনাড়ুর চোল রাজবংশের রাজরাজ প্রথম এবং রাজেন্দ্র প্রথম গুরুত্বপূর্ন রাজা ছিলেন। চোলরা অস্ত্রের জোরে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা জয় করে। কর্নাটকের হোয়সল রাজবংশের রাজা বিষ্ণুবর্ধন সমগ্র কর্নাটক জয় করেন। মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রকুট রাজবংশের তৃতীয় গোবিন্দের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকুট শক্তি কার্ণোজ থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পরে কৃষ্ণ তৃতীয় এলাহবাদ পর্যন্ত অঞ্চল জয় করেন।

পশ্চিম মহারাষ্ট্রে শিলাহরদের তিনটি রাজবংশ আবির্ভূত হয়। প্রথম রাজবংশ উত্তর কোকনের ঠানে ও রায়গড়, দ্বিতীয় রাজবংশ দক্ষিন কোকনে এবং তৃতীয় রাজবংশ কোল্হাপুর, সাতারা সাংলি এবং বেলগাও জেলার কিছু অংশে শাসন করেতে ছিল।

শিব-পূর্ব যুগের শেষ গৌরবময় রাজত্ব ছিল মহারাষ্ট্রে যাদবদের রাজত্ব। যাদব বংশের ভিল্লম পঞ্চম এর রাজধানী ছিল ঔরঙ্গাবাদের কাছে দেবগিরিতে । তিনি কৃষ্ণা নদীর ওপারে নিজের রাজ্য বিস্তার করেন। যাদব যুগকে মারাঠি ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্নযুগ বলে মনে করা হয়। এই সময়কালে মহারাষ্ট্রে মহানুভব ও বারকরী সম্প্রদায়ের উদয় হয়।

'উত্তর-পশ্চিম' দিক থেকে আক্রমন

মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রকুট এবং যাদবের মতো স্থানীয় রাজবংশদের শাসন থাকা সত্ত্বেও উত্তর পশ্চিম থেকে আক্রমন কারীরা স্থানীয় শক্তিকে পরাজিত করেছিল।

ইতিমধ্যে মধ্যপূর্ব অঞ্চলে আরব শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। আরব শাসকরা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ভারতের দিকে আগমন করে। অষ্টম শতাব্দিতে মুহম্মদ বিন কাসিম নামে একজন আরব যোদ্ধা সিন্ধু অঞ্চলে আক্রমণ করেন। ওখানের দাহির রাজার প্রতিরোধকে পরাজিত করে সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন। এই আক্রমনের কারনে প্রথমবারের মতো আরবদের ভারতের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরী হয় পরবর্তীতে মধ্য এশিয়া থেকে তুর্কি, আফগান, ও মুঘলরা ভারতে এসে, ভারতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তুর্কিরা ভারতে আক্রমন শুরু করে। তারা তাদের রাজত্ব ভারতের উত্তর-পশ্চিম সিমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল। গজনীর সুলতান মাহ্মুদ বহুবার ভরতে আক্রমন করে। এই আক্রমনের সময় তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, কার্ণোজ এবং সোমনাথের সমৃদ্ধ মন্দির লুট করে এবং বিপুল ধনসম্পদ সঙ্গে নিয়ে যায়। বখতিয়ার খলজী ইনি বিশ্ব বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেয়।

উত্তরের সুলতানশাহী

১১৭৫ এবং ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের ঘুরের সুলতান মুহম্মদ ঘোরি ভারতে আক্রমন করেন তিনি ভারতের জেতা অঞ্চলগুলি দেখাশোনার জন্য কুতুবউদ্দিন ঐবককে নিযুক্ত করেন।

পরবর্তিতে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর ঐবক তার শাসনের অধীনে থাকা ভারতের অঞ্চল স্বাধীনভাবে দেখতে শুরু করেন। ঐবক একজন স্থানিয় দাস হওয়া সাত্ত্বেও তিনি দিল্লির শাসক হন । ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

তুমি জানো কি?

কুতুবুদ্দিন ঐবকের পর অল্‌তমশ, রঝিয়া, বলবন, অলাউদ্দিন খিলজি, মুহম্মদ তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক, ইব্রাহিম লোদি ইত্যাদি প্রমুখ সুলতানেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন।

ইব্রাহিম লোদি ইনি শেষের সুলতান। তার দুশ্চরিত্রের কারনে তাহার অনেক শত্রু তৈরি হয়েছিল। পাঞ্জারের সুবেদার দৌলতখান লোদী ইনি কাবুলের মুঘল শাসক বাবরকে ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে পাচারন করলেন। এই যুদ্ধে বাবর ইব্রাহীম লোদিকে পরাজিত করেন এবং এর সাথেই সুলতানসাহির সমাপ্তি হয়।

বিজয়নগরের রাজ্য

দিল্লির সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের শাসনকালে দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দক্ষিনে বিদ্রোহ হয়। এর থেকেই বিজয়নগর ও বহমনি নামে দুটি শক্তিশালী রাজ্যের উদয় হয়।

হরিহর এবং বুক্কা দক্ষিন ভারতের দুই ভাই দিল্লির সুলতানশাহীর সেবায় প্রধান সেবক ছিলেন। তারা মুহম্মদ তুঘলকের শাসনকালে দক্ষিনের রাজনৈতিক অস্থিরশীলতার সুযোগ নিয়ে ১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিন বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমান কর্নাটকের হম্পি এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। হরিহর বিজয়নগরের প্রথম রাজা ছিলেন।

হরিহরের পর তার ভাই বুক্কা রাজত্বে আসে। বুক্কা রামেশ্বর পর্যন্ত অঞ্চলটি তার নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে।

কৃষ্ণদেবরায়: কৃষ্ণদেবরায় ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়নগরের সিংহাসনে আসেন, তিনি বিজয়ওয়াড়া এবং রাজমহেন্দ্রী জয় করে নিজের রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন। তিনি বহমনী সুলতান মহমুদ শাহের নেতৃত্বে সমবেতে আসা সকল সুলতানদের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগরের রাজ্য পূর্বে কটক থেকে পশ্চিমে গোয়া এবং উত্তরে রায়চুর দোয়াবা থেকে দক্ষিনে হিন্দ মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

কৃষ্ণদেবরায়

কৃষ্ণদেবরায় একজন পন্ডিত ছিলেন। তিনি তেলগুতে একটি রাজনৈতিক গ্রন্থ 'আমুক্ত মাল্যদা' রচনা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগরে হাজার-হাজার রাম-মন্দির ও বিঠ্ঠল মন্দির নির্মান হয়ে ছিল।

কৃষ্ণদেবরায়ের পর বিজয়নগরের রাজ্য হ্রাস পেতে শুরু হয়। বর্তমান কর্নাটক রাজ্যের তালিকোটে একদিকে আদিলশাহী, নিজামশাহী, কুতুবশাহী, বারিদশাহী এবং অন্যদিকে বিজয়নগরের রাজা রামরায়ের মধ্যে ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এর পর বিজয়নগরের রাজ্যের অবসান ঘটে।

বহমনী রাজ্য

দক্ষিণের প্রধানেরা মুহম্মদ তুঘলককে সমাপ্ত করার জন্য বিদ্রোহ করে। এই সর্দারদের প্রধান হসন গঙ্গু দিল্লীতে সুলতান বাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি নতুন রাষ্ট্র আস্তিত্বে আসে। একে বহমনি রাজ্য বলা হয়। হসন গঙ্গু বহমনি রাজ্যর প্রথম সুলতান হন। তিনি কর্নাটক রাজ্যের গুলবর্গায় তার রাজধানী স্থাপন করেন।

মহমুদ গাওয়ান: ইনি বহমনি রাজ্যের প্রধান বজির এবং একজন উত্তম প্রশাসক ছিলেন। তিনি বহমনি রাজ্যকে, অর্থনৈতিক শক্তি প্রদান করেন। সৈন্যদের জাহাগিরির পরিবর্তে নগদ বেতন দেওয়া শুরু করলেন। সেনাবাহিনীতে নিয়মবদ্ধতা এনেছেন। ভূমি

রাজস্ব ব্যবস্থায় উন্নত করেছেন। বিদর এখানে তিনি আরবী এবং উন্নত ফারসি শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য মদারসা প্রতিষ্ঠা করেন।

মাহমুদ গাওয়ানের পর বহমনি প্রধানদের মধ্যে দলাদলি বেড়ে যায়। বিজয়নগর এবং বহমনীর মধ্যে দ্বন্দের কারণে বহমনি রাজের উপর প্রতিকুল পরিনাম ঘটে। বিভিন্ন প্রান্তের অধিকারীবর্গ বেশী স্বাধিন ভাবে থাকতে শুরু করে। বহমনি রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায় এবং এর থেকে বহাডের ইমাদশাহী, বিদারের বারিদশাহী, বিজাপুরের আদিলশাহী, আহমদনগরের নিজামশাহী এবং গোলকোন্ডার কুতুবশাহী এই ভাবে বাহমনি রাজ্য পাঁচটি শাখায় পরিনত হয়।

মুঘল সত্তা (শক্তি)

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতানশাহির অবসান ঘটে। সেখানে মুঘল সত্তার প্রতিষ্ঠান হয়।

বাবর: বাবর মুঘল সত্তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি মধ্যএশিয়ার বর্তমান উজবেকিস্তানের ফরঘানা রাজ্যের রাজা ছিলেন। তিনি ভারতের সম্পদের বর্ননা শুনেছিলেন, তাই তিনি ভারতে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন।

সেই সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদি। দৌলতখান লোদি ছিলেন সুলতানশাহি পাঞ্জাব অঞ্চলের প্রধান কর্মকর্তা। ইব্রাহিম লোদিও দৌলতখান লোদীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় । দৌলতখান বাবরকে ভারতে আক্রমন করার জন্য নিমন্ত্রন জানায়। এই সুযোগে বাবর ভারতে আক্রমন করেন। বাবরের আক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য ইব্রাহিম লোদি সেনাবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন । ২১ এপ্রিল ১৫২৬ এই দিনে পানিপথে বাবরের সাথে তার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাবর প্রথমবার ভারতে কামানের ব্যবহার করলেন। তিনি ইব্রাহিম লোদির সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। এই হলো ''পানিপথের প্রথম লড়াই।''

এই যুদ্ধের পর মেওয়ারের রানাসাঙ্গা রাজপুত রাজাদের একত্রিত করেন। খানুয়া নামক এই স্থানে বাবর ও রানাসঙ্গের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাবরের কামান ও সংরক্ষিত সেনাবাহিনী অত্যন্ত প্রভাবশালী কাজ করে। রানাসাঙ্গার সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। খ্রীষ্ট ১৫৩০ সালে বাবরের মৃত্যু হয়।

তুমি জানো কি?

বাবরের পর হুমায়ুন (খ্রিষ্ট ১৫৩০ থেকে ১৫৩৯ এবং খ্রিষ্ট ১৫৫৫ থেকে ১৫৫৬) সিংহাসনে আসেন। হুমায়ুনের রাজত্বকালে শেরশাহ তাকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনে প্রতাপশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। হুমায়ুনের পর অকবর (খ্রিষ্ট ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫) সিংহাসনে আসেন। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথে অকবর ও হেমুর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এটি হল পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। তাঁর উচ্চকাঙক্ষা ছিল সমগ্র ভারতকে তাঁর ছত্রছায়ায় আনা । অকবরের পর জাহঙ্গীর (খ্রিষ্ট ১৬০৫ থেকে খ্রিষ্ট ১৬২৪) সম্রাট হন। তাঁর কর্মজীবনে তার স্ত্রী নুর জাহান প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। জাহাঙ্গীরের পর শাহজাহান (খ্রিষ্ট ১৬২৪ থেকে ১৬৫৮) সম্রাট হন। শাহজাহানের পর ঔরঙ্গজেব (খ্রিষ্ট ১৬৫৮ থেকে খ্রিষ্ট ১৭০৭) দির্ঘ সময়ের সম্রাট ছিলেন। তার মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়।

অকবর মুঘল রাজবংশের সবচেয়ে কর্তব্যপরায়ন রাজা। অকবর ভারতকে নিজের ছএছায়ার শাসনের অধীনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তখন তার বিরোধ হয়েছিল। অকবরের বিরুদ্ধে মহারানা প্রতাপ, চাঁদবিবি, রানীদুর্গাবতী যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা অসাধারন ছিল।

মহারানা প্রতাপ: উদয় সিংহের মৃত্যুর পর মেওয়ারের সিংহাসনে মহারানা প্রতাপ বসেন। তিনি মেওয়ারের অস্তিত্বের জন্য লড়াই চালিয়ে যান। মহারনা প্রতাপ শেষ অবধি পর্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য অকবরের সাথে লড়াই করেছিলেন শক্তি, সাহস, আত্মমর্যাদা, ত্যাগ ইত্যাদি গুনের কারনে তিনি ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেন ।

মহারানা প্রতাপ

চাঁদবিবি: ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে, মুঘলরা নিজামশাহীর রাজধানী অহমদনগরে আক্রমন করে। মুঘল সেনা বাহিনী অহমদনগরের দুর্গ ঘিরে ফেললেন। অহমদনগরের হোসেন নিজাম শাহের কর্তব্যপরায়ন কন্যা চাঁদবিবি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে দুর্গে যুদ্ধ করেন। এই সময় নিজামশাহীর প্রধানদের মধ্যে একটি দ্বিধা সৃষ্টি হয় । এই ঘটনার ফলে চাঁদবিবি নিহত হয়। পরে মুঘলেরা অহমদনগরের দুর্গ জয় করে। তবে সম্পূর্ণ নিজামশাহী রাজ্য মুঘলদের নিয়ন্ত্রনে আসেনি।

চাঁদবিবি

রানী দুর্গাবতী: বিদর্ভের পূর্বাংশ, মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ, বর্তমান ছত্তিশগড়ের পশ্চিমাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশের উওরাংশ এবং ওড়িশার পশ্চিমাংশ হল গোন্ডবানার বিস্তৃত অংশ। চন্দেল রাজপুত পরিবারে জন্ম নেওয়া দুর্গাবতী বিয়ের পর গোন্ডবানার রাণী হন। তিনি উত্তমভাবে রাজ-কাজ পরিচালন করেন। ইতিহাসে, মধ্যযুগীয় গোন্ডবানার রাণী দুর্গাবতীর মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দুর্গাবতী তার স্বামীর মৃত্যুর পর অকবরের বিরুদ্ধে লড়াই করে মারা যান, কিন্তু আত্মসমর্পন করেননি।

রানী দুর্গাবতী

অকবর ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন শাসক। তার ধর্মীয় নীতি উদার ও সহনশীল ছিল। তিনি সকল ধর্মের মানুষের সাথে সমান আচরণ করতেন। সকল ধর্মের মহৎ নীতিকে একত্রিত করে অকবর 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তিনি কাউকে 'দীন-ই-ইলাহী' গ্রহণ করতে বাধ্য করেননি।

ঔরঙ্গজেব: সম্রাট শাহজানের পুত্র ঔরঙ্গজেব ক্ষমতার লড়াইয়ে সফল হন এবং তার পিতাকে বন্দী করে তিনি ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট হন। শাহজাহানের জেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোহ তার ধর্মীয় সহনশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি সংস্কৃত উপনিষদ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে মুঘল সাম্রাজ্য উওরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে অহমদনগর এবং পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত বিস্তিৃত ছিল। ঔরঙ্গজেব তার রাজত্ব কালে পূর্ব আসামের, দক্ষিণে বিজাপুরের আদিলশাহী ও গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী ধ্বংস করে ওই অঞ্চল নিজের সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন।

ঔরঙ্গজেব

আহোমদের সাথে বিরোধ: খ্রিস্টীয় ১৩ শতকে শান জাতীয় লোকেরা ব্রহ্মপুত্র নদী কুলে বসতি স্থাপন করে। সেখানে তারা নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় লোকেরা এই লোকদেরকে আহম বলে ডাকত।

ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে আহোমদের মুঘলের সাথে দীর্ঘ লড়াই চলে। মুঘলরা আহোম অঞ্চলে আক্রমন করে, গদাধর সিংহের নেতৃত্বে আহোম সংগঠিত হয়। লাচ্ছিত বড়ফুকন মুঘলদের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই করেন। আহোমেরা মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করে। মুঘলরা আসামে তাদের সত্তা সংগঠিত করায় কঠিন বলে মনে করলেন।

শিখদের সাথে সংগ্রাম: শিখদের নবমগুরু গুরুতেঘবাহাদুর ইনি ঔরঙ্গজেবের অসহিষ্ণুতা ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে নিজের বিরোধিতা প্রকাশ করেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে শিরশ্ছেদ করে।

গুরু গোবিন্দসিং

তারপর গুরু গোবিন্দসিং শিখদের গুরু হন। গুরুগোবিন্দসিং তার অনুসারীদের একত্রিত করেন এবং তাদের মধ্য যুদ্ধের মনোভাবনা তৈরি করেন। যুদ্ধরত শিখ যুবকদের একটি দল গঠিত হয়। একে 'খালসা দল' বলা হয়। আনন্দপুর ছিল তাদের প্রধান কেন্দ্র। ঔরঙ্গজেব শিখদের বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী পাঠান। তার সৈন্য - বাহিনী আনন্দপুরে আক্রমণ করে। সে সময় শিখরা প্রচন্ড যুদ্ধ করে, কিন্তু তারা সফল হয়নি। এর পর গুরু গোবিন্দসিং দক্ষিণে আসেন। খ্রিস্ট ১৭০৮ সালে নান্দেড়ে তাঁর উপর আক্রমন হয়। তারপর তিনি মারা যান।

রাজপুতদের সাথে সংগ্রাম: অকবর তার মিলনের নীতিতে রাজপুতদের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব রাজপুতদের সমর্থন পেতে পারেননি মারওয়ারের রানা যশবন্ত সিং এর মৃত্যুর পর, তার রাজ্য ঔরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করে। দুর্গাদাস রাঠোর যশবন্ত সিং-এর কনিষ্ঠ পুত্র অজিত সিং কে মারওয়ারের সিংহাসনে বসিয়েছিলন। দুর্গাদাস রাঠোর মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলেন। দুর্গাদাসের প্রতিরোধকে নষ্ট করার জন্য ঔরঙ্গজেব যুবরাজ অকবরকে মারওয়ারা পাঠান। যুবরাজ অকবর নিজেই রাজপুতদের সঙ্গে দেখা করে এবং তিনি ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহে মহারাষ্ট্রে মারাঠাদের সাহায্য নেওয়ারও চেষ্টা করা হয়েছিল। দুর্গাদাস রাঠোর মারওয়ারার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালিয়ে যান।

মারাঠাদের সাথে সংগ্রাম: শিবাজী মহারাজের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে *স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠিত হয়। *স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ট্রায় শিবাজী মহারাজকে অন্যান্য শত্রুদের সাথে-সাথে মুঘলদের সাথেও যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব সমগ্র দক্ষিণ ভারত জয় করার অভিপ্রায়ে দাক্ষিনাত্যে আসেন। কিন্তু মারাঠারা ঔরঙ্গজেবের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। এইভাবে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। এই সমস্ত সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা পরের অধ্যায়ে অধ্যায়ন করব।

অনুশীলনী

১. নাম বলো

(১) গোন্ডবানার রানী -

(২) উদয়সিং এর পুত্র -

(৩) মুঘল সত্তার প্রতিষ্ঠাতা -

(৪) বহমনী রাজ্যের প্রথম সুলতান -

(৫) গুরুগোবিন্দসিং দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা একটি দল

২. সমূহের আলাদা বিকল্প বেছে নাও

(১) সুলতান মুহম্মদ, কুতুবুদ্দীন ঐবক, মুহম্মদ ঘোরী, বাবর।

(২) আদিলশাহী, নিজামশাহী, সুলতানশাহী, বরীদশাহী

(৩) অকবর, হুমায়ুন, শেরশাহ, ঔরঙ্গজেব।

৩. অল্প কথায় উত্তর লেখো।

(১) বিজয়নগর ও বহমনি এই দুই রাজ্য কেন উদয় হয়েছিল?

(২) মহমুদ গাওয়ান কোন সুধার করেছিলেন?

(৩) আসামে মুঘলরা নিজেদের সত্তা স্থায়ী করায় কেন অসমর্থ হয়েছিল?

৪. নিজের শব্দে সংক্ষেপে জানকারী লেখো।

(১) কৃষ্ণদেররায়

(২) চাঁদবিবি

(৩) রানীদুর্গাবতী

৫. **কারণ লেখ।**

(১) বহমনি রাজ্য পাঁচ শাখায় পরিনত হয়।

(২) রানাসঙ্গের সৈন্য বাহিনী পরাজিত হয়

(৩) রানা প্রতাপ ইতিহাসে অমর হয়ে গেলেন।

(৪) ঔরঙ্গজেব গুরুতেঘবাহাদুরকে বন্দী করে।

(৫) রাজপুতরা মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

৬. **কালরেখা পূরণ করো।**

১৩৩৬ খ্রিস্ট	.... খ্রিস্ট	১৫০৯ খ্রিস্ট	.........খ্রিস্ট
বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠান	বহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠান	--------------	মুঘল সত্তার প্রতিষ্ঠান

৭. **ইন্টারনেটের সাহায্যে তোমার পছন্দের যে-কোন এক ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ কর ও নিচের ছকে লেখো**

আমি এটা জানী:

____

____

____

____

উপক্রম

পাঠ্যংশে সমাবিষ্ট ব্যক্তি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সন্দর্ভসাহিত্য, ইন্টারনেট, খবরের কাগজ ইত্যাদির সাহায্য নাও। উপক্রমের খাতায় ছবির - জানকারী কোলাজ তৈরী কর ও ইতিহাস কক্ষে তার প্রদর্শন করো।

দেবগিরী কিল্লা

৩. ধার্মিক সমন্বয়

ভাষা ও ধর্মের বৈচিত্র্য ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্টের বিবেচনা করে ভারতের সংবিধান অন্তঃ ধর্মীয় সমতার নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতির ভিত্তিতে মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক জীবনে ও ধর্মীয় সম্প্রীতি চেষ্টা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের সমাজে ভক্তি আন্দোলন, শিখ ধর্ম ও সুফিবাদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ভিন্ন মতাদর্শ গঠিত হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির সাথে-সাথে ধর্মীক ও সাম্প্রদায়িক সহপ্রীতির উপর জোর দিয়েছে। এই সম্পর্কে আরও তথ্য আমরা এই অধ্যায়ে জেনে নেব।

ভারতের ধর্মীয় জীবনের শুরুতে আচার - অনুষ্ঠান ও ধর্মতত্ত্বের উপর বিশেষ জোর ছিল। মধ্যযুগে এই উভয় পথই পিছিয়ে পড়ে এবং ভক্তির পথ গুরুত্বপূর্ণ ভাবে জেগে ওঠে। এইভাবে মতের পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে ধর্মীয় সম্প্রীতি আরও বেড়ে উঠেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী স্থানীয় *ভক্তি মূলক* উদ্ভাবনা পাওয়া যায়। এই সপ্রদায় সংস্কৃতের পরিবর্তে সাধারণ ভাষা গ্রহণ করেছিল। তাই এইসব প্রাদেশিক ভাষার বিকাশের ভূমিকায় ধর্মীয় আন্দোলনের বিশেষ স্থান রয়েছে।

ভক্তি আন্দোলন: ভক্তি আন্দোলনের উৎপত্তি দক্ষিণ ভারতে হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই অঞ্চলে নায়নার ও অলবারে ভক্তিমূলক আন্দোলনের উদয় হয়, নায়নার শিবভক্ত ও অলবার বিষ্ণুভক্ত ছিল। শিব ও বিষ্ণু এক মনে করে নিয়ে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্ঠা করা হয়েছিল।অর্ধেক অংশ বিষ্ণুর ও অর্ধেক অংশ শিবের দেখিয়ে বিশাল সংখ্যায় 'হরিহর' আকারে প্রচুর মূর্তিও তৈরি করা হয়েছিল। এই ভক্তিমূলক আন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সহভাগি হয়েছিল। ঈশ্বরপ্রেম, মানবতা, ভূতদয়া, করুনা ইত্যাদি মুল্যবোধক শিক্ষা তারা দিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতে রামানুজ এবং অন্যান্য আচার্যরা ভক্তি আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। 'ঈশ্বর সবার জন্য, 'ঈশ্বর বৈষম্য সৃষ্টি করেন না।' এটা তিনি বলেছিলেন। উত্তর ভারতেও রামানুজনের শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব ছিল।

উত্তর ভারতে সাধক রামানন্দ *ভক্তির* গুরুত্বের কথা বলেছেন। সাধক কবির ভক্তি আন্দোলনে একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি তির্থস্থান, ব্রত, মূর্তিপূজকে গুরুত্ব দেননি। তিনি সত্যকেই ঈশ্বর মনে করতেন। তিনি শিখিয়েছেন যে সকল মানুষ এক। জাত, পন্থ, ধর্ম ভেদ বিবেচনা করেন নি। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে এক করতে চেয়েছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের কট্টরপন্থীদের কঠোর শব্দে নিন্দা করেছিলেন।

সাধক কবির

বাংলায় চৈতন্য মহাপ্রভু *কৃষ্ণভক্তির* গুরুত্বের কথা বলেছেন। তাঁর প্রচারের কারণে মানুষ জাতি ও ধর্মের সিমানা পেরিয়ে ভক্তি আন্দোলনে যোগ দেয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে শঙ্করদের আসামে কৃষ্ণভক্তি ছড়িয়ে দেয়। সাধু নরসি মেহেতা গুজরাটের একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি সমতার বার্তা দিয়েছিলেন। তাকে গুজরাটি ভাষায় মাতা কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সাধিকা মিরাবাই কৃষ্ণভক্তির মহিমান্বিত করেছেন। তিনি মেওয়ার রাজরংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রাজপরিবারের ভোগ-বিলাস ত্যাগ করেন এবং কৃষ্ণ ভক্তিতে নিমগ্ন হন। তিনি রাজস্থানী এবং গুজরাটি ভাষায় ভক্তিরচনা করেছেন। তাঁর ভক্তিমূলক গান ভক্তি, সহিষ্ণুতা ও মানবতার বার্তা দেয়। সাধক রোহিদাস ছিলেন একজন মহান সাধক। তিনি সাম্যতার ও মানবতার প্রচার করেছেন। সন্তসেনা একজন প্রভাবী

সাধক ছিলেন। হিন্দী মহাকবি সুরদাস ‘সুরসাগর’ কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণভক্তি তার কবিতার মূলবিষয় ছিল। মুসলিম সাধক রাসখান রচিত কৃষ্ণ - ভক্তিগান রসে পরিপূর্ণ। তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’ রাসভক্তির একটি সুন্দর আবিষ্কার।

কর্নাটকে মহাত্মা বসেশ্বর লিঙ্গায়ত মতাদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি শ্রমপ্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তার ‘কায়কবে কৈলাস’ একটি বিখ্যাত উক্তি। যার অর্থ হয় শ্রম মানেই কৈলাস। তাঁর আন্দোলনে নারীদেরও সহভাগী করেন। ‘অনুভব - মন্ডপ’ এই সভামণ্ডপ ধর্মচর্চায় সমস্ত বর্নের নারী পুরুষেরা অংশ নিতে শুরু করেন। তিনি লোকবাহিনীর মাধ্যমে কন্নড ভাষায় তাঁর শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর কাজ সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বসেশ্বরের অনুগামীরাও মারাঠী ভাষায় রচনা করেছেন। তার মধ্যে মন্মথ স্বামী রচিত ‘পরমরহস্য’ গ্রন্থটি বিখ্যাত। পাম্প, পুরন্দরদাস প্রভৃতি কার্নাটকের মহান সাধক ছিলেন, তাঁরা কন্নড ভাষায় অনেক ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করেছেন।

মহাত্মা বসেশ্বর

মহানুভবপন্থ: ত্রেয়োদশ শতাব্দিতে চক্রধর স্বামী মহারাষ্ট্রে মহানুভব পন্থের প্রবর্তন করেন। এটি একটি কর্ম যা কৃষ্ণভক্তির প্রচার করে। শ্রীগোবিন্দপ্রভু ছিলেন চক্রধর স্বামীর গুরু। চক্রধরের শিষ্যদের মধ্যে সমস্ত জাতি ও উপজাতির পুরুষ ও মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সমতার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি সম্পুর্ন মহারাষ্ট্র জুড়ে মারাঠিতে প্রচার করেন। তিনি সংস্কৃতের পরিবর্তে মারাঠি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ফলে মারাঠি ভাষার উন্নতি হয়। মারাঠি ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ নির্মিত হয়েছিল ।

চক্রধর স্বামী

এই সম্প্রদায়টি মহারাষ্ট্রে প্রধানত বিদর্ভ ও মারাঠবাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বিদর্ভের ঋদ্বিপুর এই সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্থান। এছাড়াও এই সম্প্রদায়টি পাঞ্জাব, আফগানিস্তান পর্যন্ত পৌছেছিল।

তুমি জানো কি?

মহানুভব সম্প্রদায়ের অনুগামীদের কয়েকটি প্রধান রচনা নিম্নরূপ:- ‘লীলাচরিত্র’ মহায়ভট সম্পাদিত চক্রধরের লীলা বর্ণনকারী একটি গ্রন্থ। প্রথম মারাঠি কবি মহাদম্বার ‘ধাবলে’ কেশোবাস সম্পাদিত ‘সূত্রপাঠ ও দৃষ্টান্তপাঠ’ দামোদর পন্থিতের ‘বচ্ছুহরন’, ভাস্করভট্ট রোরীকরের শিশুপাল বধ, নরেন্দ্রের ‘রুক্মিনীশ্বয়ংবর।’

তুমি জানো কি?

মহারাষ্ট্রে সাধক একনাথের লেখা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংলাপ ধর্মীয় সম্প্রীতির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণের। সাধক শেখ মোহাম্মদের বিখ্যাত উক্তি‘শেখ মোহাম্মদ আবিন্দ। তার হৃদয় গোবিন্দ।’ এই উক্তি ধার্মিক সমন্বয়ের একটি উত্তম উদাহরন।

গুরুনানক: গুরুনানক ছিলেন শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গুরু। তাঁর কাজকে ধর্মীয় সম্প্রীতির এক মহৎ প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করা উচিৎ।

তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিদর্শন করলেন। তিনি মক্কায়ও গিয়েছিলেন। ভক্তি সর্বত্র সমান এটা তিনি উপলব্ধি করলেন। তার শিক্ষা ছিল সবার সাথে সমান আচরণ করা। তিনি হিন্দু মুসলমানদের ঐক্যর জন্য প্রচার করতেন। তিনি শুদ্ধ আচরনকে গুরুত্ব দিতেন।

গুরুনানকের শিক্ষা দ্বারা অনেক মানুষ প্রভাবিত হয়েছিল। দিনে-দিনে তাঁর শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে

গুরুনানক

গুরুনানকের অনুগামীদের শিষ্য অর্থাৎ 'শিখ' বলা হয়। 'গুরুগ্রন্থসাহিব' শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে স্বয়ং গুরুনানক, সাধক নামদেব, সাধক কবির প্রমুখ সাধকদের রচনা রয়েছে।

গুরু নানকের পর শিখদের নয়জন গুরু হয়েছে। গুরু গোবিন্দ সিং ছিলেন শিখদের দশম গুরু। তারপর, সমস্ত শিখ গুরু গোবিন্দ সিং-এর আদেশ অনুসারে ধর্মগ্রন্থ 'গুরুগ্রন্থসাহিব' কে তাদের গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে।

সুফিবাদ : সুফিবাদ ইসলামের একটি সম্প্রদায়। প্রভুপ্রেমময়ী। ঈশ্বরের কাছে পৌছানোর একমাত্র উপায় হল প্রেম এবং ভক্তি এমনই সুফি সাধকদের বিশ্বাস ছিল। তাঁর শিক্ষা ছিল সকল প্রাণীকে ভালোবাসা প্রভুর ধ্যান করা, সরলভাবে জীবনযাপন করা। খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি, শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া ছিলেন মহান সুফি সাধক। সুফি সাধকদের শিক্ষার ফলে হিন্দু - মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় সঙ্গীতে সুফি সঙ্গীত ঐতিহ্য মূল্য যোগ করেছে।

সাধকদের শেখানো ভক্তিপথ সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুসরন করা সহজ ছিল। ভক্তিমূলক আন্দোলনে নারী-পুরুষ সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিল। সাধুগন লোকাচারের মাধ্যমে তাদের ভাবনা প্রকাশ করেছেন। সাধারন জনগন এটিকে কাছাকাছি বলে মনে করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির একীকরনে ভক্তির পথ একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।

অনুশীলনী

১. পারস্পরিক সম্পর্ক খুজে লেখো।

(১) মহাত্মা বাসেশ্বর: কর্নাটক,
সাধক মীরাবাই: ....

(২) রামানন্দ: উত্তরভারত
চৈতন্য মহাপ্রভু: ....

(৩) চক্রধর: ....
শঙ্করদেব: ....

২. নিম্ন তালিকা পূরন করো।

	সম্প্রচারক	গ্রন্থ
(১) ভক্তি আন্দোলন	....	....
(২) মহানুভব পন্থ	....	....
(৩) শিখ ধর্ম	....	....

৩. লেখন করো

(১) সাধক কবির ভক্তি আন্দোলনে একজন বিখ্যাত সাধক হিসাবে আবির্ভুত হন।

(২) মহাত্মা বসেশ্বরের কাজের সমাজের উপর পড়া প্রভাব।

৪. নিচের ছকে লুকিয়ে থাকা সাধকদের নাম খুজে লেখো।

গু	রু	গো	বি	ন্দ	সি	ং	স	স
রু	রা	মা	নং	ন	সু	র	দা	স
না	সে	ত	সং	র	ল	র	হি	পং
ন	চ	স	সা	ত	দ	বী	রো	প
ক	ম	গ	ম	রং	অ	ক	স	আ
ব	র	স	পু	অ	প্র	থ	ম	রু
ম	ক্ষ	থ	স্বা	মী	রা	বা	ই	স

উপক্রম

সুফি সঙ্গীত ঐতিহ্য থেকে একটি ভজন-কীর্ত্তন সংগ্রহিত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করো।

৪. শিবপূর্বকালিন মহারাষ্ট্র

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে, মহারাষ্ট্রের বেশিরভাগ অঞ্চল অহমদনগরের নিজামশাহ ও বিজাপুরের আদিলশাহের নিয়ন্ত্রনে ছিল। মুঘলেরা খানদেশে আক্রমণ করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল যে দক্ষিণে তাদের সত্তার বিস্তার কি ভাবে করা যায়। কোকনের তীরে আফ্রিকা থেকে আসা সিদ্দিদের বসতি ছিল। একই সময়ে, ইউরোপ থেকে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি এবং ডাচ শক্তির মধ্যে সমুদ্রসীমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছিল। তারা বানিজ্যের জন্য বাজার দখল করতে সংগ্রাম করছিল। পশ্চিম উপকুলে গোয়া এবং বসইতে পর্তুগিজরা পূর্বেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। তদ্রুপ ইংরেজ, ডাচ, ফরাসিরা বানিজ্যের কম্পানির মাধ্যমে গুদাম স্বরুপে বাজারে প্রবেশ করেছিল। এই সমস্ত সত্তা একে-অপরকে জাচাই করে নিজেদের নিরাপদে রাখে। এবং যতটা সম্ভব অধিপত্য করতে আরম্ভ করেছিল। এই সংঘর্ষের কারনে মহারাষ্ট্রে অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরী হয়েছিল। ইউরোপে এই বিভিন্ন লোককে তাদের শিরস্ত্রনার আধারেই 'টোপকার' বলা হত।

শিবপূর্বকালে লোকবসতি, প্রজা ও শাসকদের মধ্যে যোগসুত্র হিসেবে কাজ করে এমন কর্মকর্তা, বাজার, কারিগর ইত্যাদির প্রকৃতি বোঝার জন্য গ্রাম (মৌজা) শহরের ভৌগলিক অবস্থান জানার প্রয়োজন হয়। অনেক গ্রাম মিলে পরগণা তৈরী হয়। পরগণার প্রধান স্থানকে সাধারনত শহর বলা হত। শহর থেকে ছোট গ্রামকে মৌজা বলা হত। এখন আমরা সংক্ষেপে গ্রাম, শহর, ও পরিষদের বিষয় জেনে নেব।

গ্রাম *(মৌজা)*: অধিকাংশ লোক গ্রামেই বসবাস করত। গ্রামকে মৌজাও বলা হত। গ্রামের পাটিলকে গ্রামের প্রমুখ বলে মান্য করা হত। গ্রামের অধিকাংশভূমি চাষের-জন্য ব্যবহার করার দরকার এর জন্য গ্রামের পাটিল অর্থাৎ মুখিয়া সবসময় চেষ্টা করত। গ্রামে যখন ঝগড়া হতো, তখন পাটিল শান্তি প্রতিষ্ঠানের কাজ করত। কুলকর্ণি তার কাজে সাহায্য করত। কুলকর্ণি রাজস্বের অভিলেখ অথবা লেখা-পড়ার কাজ করতেন। গ্রামে বিভিন্ন কারিগর ছিল। তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যবসার অধিক।র ছিল। গ্রামের কারিগরদের সেবার জন্য তারা কৃশকদের কাছ থেকে ফসলের একটি অংশ পেত, ফসলের এই অংশকে পরজা (বলুত) বলা হতো।

***কসবা* :** একটি বড়গ্রামকে কসবা বলা হয়। সাধারণতঃ এটি পরগণার প্রধান স্থান। যেমন, ইন্দাপুর পরগণার প্রধান স্থান ইন্দাপুর কসবা। ওয়াই পরগণার প্রধান স্থান ওয়াই কসবা। গ্রামের মতো কসবাতেও প্রমুখ ব্যবসা কৃষিকাজ ছিল। সেখানে ছুতার, কামার প্রভৃতি দক্ষ কারিগরও ছিল। কসবা কাছা-কাছি বাজারেও ছিল। শেঠ ও মহাজন বাজারের জাগীরদার ও প্রশাসক ছিল। প্রতিটি গ্রামে যে বাজার ছিল তাহা নয় তবে গ্রামে বাজার বসানোর কাজ শেঠ মহাজনেরা করত। এর জন্য তারা সরকারের কাছ থেকে জমি ও গ্রামবাসির কাছ থেকে কিছু অধিকার পেত। বাজার পেঠের হিসাব রাখার কাজ মহাজন করত।

তুমি ইহা জানো কি?

জিজাবাইয়ের নির্দেশে পুনের নিকট পাষানে একটি *পেঠ* (হাট) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। তাকে 'জিজাপুর' বলা হত। মালপুর, খেলাপুরা, পরশপুরা, বিঠাপুরাও ঔরঙ্গাবাদের বসানো নুতন-নুতন *পেঠ* (বাজার)। এই নুতন *পেঠ* মালোজি, খেলোজি, পারসোজি এবং বিঠোজি নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'খেড়' এর সাথে সংযুক্ত 'শিবাপুর' শিবাজী মহারাজের নামে বসানো একটি *পেঠ* ছিল।

এসো বুঝে নেই।

দুটি গ্রাম স্বাধীন এটা দর্শানোর জন্য 'বুদ্রুক' ও 'খুর্দ' এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। আদি গ্রাম 'বুদ্রুক' ও নতুন গ্রাম 'খুর্দ'। যেমন - বড়গাঁও বুদ্রুক ও বড়গাঁও খুর্দ।

পরগণা: বহুগ্রাম মিলে পরিসদ গঠন হলেও সকল পরগণায় যে গ্রামের সংখ্যা এক ছিলো তাহা নয়। যেমন, পুনে পরগণা, একটি বড় পরগণা ছিল। এর ২৯০টি গ্রাম ছিল। চাকন পরগণায় ৬৪ টি গ্রাম ছিল। শিরওয়াল পরগণা ছোট ছিল। এর ৪০টি গ্রাম ছিল। দেশমুখ ও দেশপান্ডে ছিলেন পরগণার জাগিরদার অধিকারী। দেশমুখ পরগণার পাটিলদের প্রমুখ ছিলেন। পাটিল গ্রামস্তরে যেকাজ করত একই রুপে দেশমুখও পরগণাস্তরে সেই কাজ করত। এইভাবে পরগণার সকল কুলকর্ণিদের প্রমুখ দেশপান্ডে ছিলেন। গ্রাম স্তরে যে কাজগুলি কুলকর্নির করতে হতো, একই কাজ পরগণা স্তরে দেশপান্ডের করতে হতো। এই জাগিরদার অধিকারী প্রজা ও সরকারের মধে যোগসুত্রের কাজ করত।

যখন পরগণার গ্রামে খরা বা অকাল দেখা দিত, তখন জাগিরদারিরা বিষয়টি সরকারের কাছে তুলে ধরার কাজ, করত। অনেক সময় এই কর্মকর্তারা তাদের এই কর্তৃত্বের অপব্যবহার করতেন। কখনও কখনও তারা প্রজাদের কাছ থেকে বেশি অর্থ সংগ্রহ করতেন, আবার কখনও তারা প্রজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ সরকারের কাছে জমা করতে বিলম্ব করতেন। এমত অবস্থায় প্রজাগণের কষ্ট হত।

তুমি ইহা জানো কি?

বতন একটি আরবি শব্দ, এবং মহারাষ্ট্রে বংশগত এবং স্থায়ীভাবে মুক্তভূমি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অকাল সঙ্কট : কৃষিকার্য ছিল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে জমিতে ফসল হয় না এবং ফসলের দামও বেড়ে যায়। মানুষের খাবার জোগাড় করা কঠিন হয়ে যায়। পশুরাও খাদ্য পায়না। জলের অত্যন্ত সংকট দেখা দেয়। গ্রামে মানুষের বসবাস করা কঠিন হয়ে যায়। লোকজন গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। তারা এদিকে-ওদিকে ঘুরতে বাধ্য হয়। দুর্ভিক্ষ জনগনের জন্য একটি বড় সংকটে পরিনত হয়ে দাড়ায়।

মহারাষ্ট্রে ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে এই রকম এক বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শস্যের তিব্র সংকট হয়েছিল। লোকেরা এক টুকরো রুটির জন্য নিজেকে বিক্রি করতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু কেনার জন্য কেউ ছিল না। পরিবার ধ্বংস হয়েছে। গরু-বাছুর মারা গেছে। কৃষিব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে। ব্যবসা বানিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। আর্থিক আদান-প্রদান বন্ধ হয়েছে। লোকজন পালাতে থাকে। এমন ছিন্ন-ভিন্ন মানুষের জীবনকে পুনর্গঠন করা ছিল বড় কষ্টের।

বারকরী সম্প্রদায়ের কাজ: সমাজে কুসংস্কার ও আচার অনুষ্ঠানের প্রবল প্রভাব ছিল। মানুষ আস্তিকতার আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল। তাদের প্রচেষ্টা কম হয়ে গিয়য়ছিল। প্রজাদের অবস্থা খুবই খারাব ছিল। এমতাবস্থায় মহারাষ্ট্রের বারকারি সম্প্রদায় সমাজে চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল।

মহারাষ্ট্রে সাধক নামদেব, সাধক জ্ঞানেশ্বর থেকে শুরু হওয়া সাধক ঐতিহ্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই সাধক ঐতিহ্যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যেমন - সাধক চোখামেলা, সাধক গোরোবা, সাধক সাওতা, সাধক নরহরি, সাধক সেনা, সাধক শেখ মোহাম্মদ ইত্যাদি। একইভাবে এই সাধকদের মধ্যে সাধক চোখোবার স্ত্রী সাধক সোয়রাবাই এবং বোন সাধ্বী নির্মলাবাই, সাধ্বী মুক্তাবাই, সাধ্বী জনাবাই, সাধ্বী কানহোপাত্রা, সাধ্বী বহিনাবাই সিউরকরও সাধকদের মধ্যে ছিলেন। এই সাধকদের আন্দোলনের

কেন্দ্রবিন্দু ছিল পন্ডরপুর। ভগবান বিঠ্ঠল ছিল তাদের দেবতা পন্ডরপুরে চন্দ্রভাগা নদীতট এই সকল সাধক ও বারকরীগণ ভক্তি সাগরে স্নান করতেন। সেখানে ভজন, কীর্তন ও সহভোজনের (কালা) মাধ্যমে সমতা ছড়িয়ে পড়ত।

সাধক নামদেব : ইনি বারকারি সম্প্রদায়ের একজন মহান সাধক ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন।

সাধক নামদেব

তিনি একজন বড় কির্তন কারও ছিলেন। কীর্তনের মাধ্যমে তিনি সকল নারীপুরুষকে একত্রিত করতেন এবং তাদের মধ্যে সমতার বোধ জাগ্রত করতেন। 'নাচু কির্তনাচে রঙ্গী। জ্ঞান দীপ লাভু জগী।।'' এই ছিল তাঁর অঙ্গীকার। তাঁর অভঙ্গরচনা সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর শিক্ষা অনেক সাধক ও সাধারন মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি তাঁর বিচারের প্রচার পাঞ্জাব পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলেন। তাঁর লেখা শ্লোকগুলি শিখদের 'গুরুগ্রন্থ - সাহিব' এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি ভাগবত ধর্মের বার্তা গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়াব কাজ করেছিলেন। তিনি পন্ডরপুরে বিঠ্ঠলের মহাদ্বারের সামনে সাধক চোখামেলার সমাধি নির্মাণ করেন। ''তাঁর এই কাজটি অবিস্মরনীয়।''

সাধক জ্ঞানেশ্বর : তিনি বারকারী সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি 'ভগবদ গীতা' এই সংস্কৃত গ্রন্থ এর অর্থ মারাঠী ভাষায় ব্যাখ্যা করে 'ভাবার্থদীপিকা' অর্থাৎ 'জ্ঞানেশ্বরী' গ্রন্থটি রচনা করছেন। তদ্রুপ তিনি 'অমৃতানুভব' গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি

সাধক জ্ঞানেশ্বর

তাঁর গ্রন্থ থেকে ও অভঙ্গ থেকে ভক্তিপথের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এতে সাধারণ মানুষ আচারণ করতে পারবে এই ধরনের আচার ধর্মের কথা বলা হয়েছে। বারকরী সম্প্রদায়কে ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়ে দেন। অত্যন্ত প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যেও জীবন যাপন করতে হয়েছে তবুও তিনি নিজের মনের সন্তুলন নষ্ট হতে দেন নাই এবং মনে কখনো খলতাও রাখেন নী। জ্ঞানেশ্বরীর 'পসায়দান' একটি মহৎ আচারিক। জ্ঞানেশ্বরের ভাই সাধক নিবৃত্তিনাথ এবং সাধক সোপানদেব এবং বোন মুক্তাবাই ও তাদের কবিতার জন্য বিখ্যাত।

সাধক একনাথ : তিনি মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনের একজন মহান সাধক ছিলেন।

সাধক একনাথ

তাঁর সাহিত্য প্রচুর ও বৈচিত্রময় ছিল। এর মধ্যে রয়েছে অভঙ্গ, গৌলানী, ভারুডে ইত্যাদি। তিনি ভাগবত ধর্মের সরল ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ রামায়নে রামকথা উপলক্ষে লোকজীবনের ছবি এঁকেঁছে। তিনি ভাগবত এই সংস্কৃত গ্রন্থের ভক্তিমূলক অংশের ব্যাখ্যা মারাঠী ভাষায় করেছেন। তাঁর অভঙ্গে অন্তরঙ্গতা রয়েছে। তিনি নিজের আচর-আচরণ দ্বারা দেখিয়েছেন যে পরমার্থ অথবা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঘর-গৃহস্থী ত্যাগের প্রয়োজন নাই। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃতি লোকশিক্ষক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর মারাঠি ভাষা অন্য ভাষার চেয়ে কম নয়। 'সংস্কৃত বানী দেবে কেলী। তরী প্রাকৃত কায় চোরাপাসুনি ঝালি?' এই ভাবে তিনি সংস্কৃত পন্ডিতদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। যারা অন্য ধর্মকে তিরস্কার করে তাদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন।

সাধক তুকরাম

সাধক তুকারাম : সাধক তুকারাম পুনের কাছে দেহু নামক গ্রামে বসবাস করতেন। তাঁর অভঙ্গরচনা প্রসন্ন ও প্রাসাদিক। তাঁর অভঙ্গ শ্রেষ্ঠ কবিতার উচ্চতা অর্জন করেছে। সাধক তুকারামের

'গাথা' মারাঠী ভাষার এক অমূল্য ধন। তিনি দুঃখী - তাপী মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখতে ও পেতো বলেছেন। তিনি বলেছেন, জে কা রঞ্জলে গাঞ্জলে। ত্যাষী ম্হনে জো আপুলে। তোচি সাধু ওড়খাবা। দেব তেথেচ জানাবা।। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তিনি জনগনকে দেওয়া ঋনের নথিপত্র ইন্দ্রায়নী নদীতে ডুবিয়ে দেন এবং বহু পরিবারকে ঋনমুক্ত করেন। তিনি সমাজের ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের কঠোর শব্দে নিন্দা করেন। ভক্তির সঙ্গে নৈতিকতা যুক্ত করার ওপর তাঁর জোর ছিল। 'জোড়ানিয়া ধন উত্তম ব্যবহারে। উদাস বিচারে বেছ করি।' এটাই তাঁর শিক্ষার সারমর্ম। সমাজের কিছু কুসংস্কারি মানুষ তাঁর জনজাগৃতি কাজের বিরোধিতা করেছে। তাঁর অভঙ্গ রচনার অধিকার নাই এই দাবি করে, তাঁর বইগুলো ইন্দ্রায়নী নদীতে ডুবিয়ে দেয়। এই সমস্ত বিরোধিতা তিনি ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছেন।

সন্ত তুকারামের শিষ্য ও সহযোগীরা ছিলেন বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের। নাওজী মাড়ী, গবনরশেট বানী, সন্তাজী জগনাড়ে, শিববা কাসার, বহিনাবাই শিউরকর, মহাদজী পন্ত কুলকাতর্ণ এই তাদের মধ্য কয়েকজনের নাম। গঙ্গারামপন্থ মবাল এবং সন্তাজী জগনাডের দ্বারা সন্ত তুকারামের অভঙ্গ লিখে রাখা হয়েছে এটা তাদের জন্য একটা মহত্বপূর্ণ যোগদান বলে মনে করা যায়।

সাধক কর্মের পরিনতি : সাধকেরা মানুষকে সমানতার উপদেশ দিয়েছেন। মানবতা ও মানবতাধর্ম শিখিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা ছিল একে অপরকে ভালবাসা, একত্রিত হওয়া এবং ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করা। তাঁর কাজে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। মানবনির্মিত সঙ্কট, খরা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কীভাবে জীবন যাপন করা যায় সে বিষয় তাঁদের পরামর্শ একটি প্রধান আধার ছিল। সাধকদের কাজ মহারাষ্ট্রে মানুষের আস্থা জাগিয়েছে। যখন-যখন সমাজে ধর্মের অবনতি ঘটেছে তখন-তখন সন্তগন সম্মুখে এসে সমাজের রক্ষা করেছে। তাঁরা ধর্মের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের মাঝে বসবাস করে তাদের সুখ দুঃখের কথা বুঝিয়ে ভক্তিমার্গের অনুসরণ করতে বলেছেন। এমন সময় সমাজের কিছু কুসংস্কারী মানুষ তাঁদের বিরোধিতা করতে শুরু করে, কিন্তু সাধকরা বিশ্বাস করতেন যে এই ধরণের বিরোধিতা সহ্য করা ও তাঁদের কর্তব্যের একটা অংশ। **'তুকা ম্হনে তোচি সন্ত। সোশী জগাচে আঘাত।।'** এই কথায় সাধক তুকারাম প্রকৃত সাধকের লক্ষন বর্ননা করেছেন।

ধর্ম-শাস্ত্রী ও পন্ডিতদের কঠিন ভাষাকে সাধকগন মানুষের সাধারণ ভাষায় নিয়ে আসেন। প্রাতিদিনের বোলচালের ভাষা দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেছেন। প্রভুর সামনে সকলেই সমান এই ধরনের মান্যতা রেখেছিলেন। তিনি সমাজকে শিখিয়েছিলেন যে জাতি এবং বর্ণের অহংকার বাদ দিয়ে আমাদের এক অপরকে 'ঈশ্বরের সন্তান' হিসাবে দেখা উচিত। এই সমস্ত সাধকদের বিশিট এই যে, ভক্তি করতে গিয়ে তাঁরা কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা তাদের নিজেদের কাজ কর্মের মধ্যে প্রভুকে দেখেছেন। **'কান্দা মুড়া ভাজী। অওঘী বিঠাই মাঝী।।'** এমনটাই সাধক সাওতা মহারাজ বললেন। যদিও তার এই বক্তব্য কৃষি কাজের সাথে সম্পর্কিত, তবুও সাধকদের দৈনিক জিবনের কাজের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। সাধকগন নিজেদের ব্যবসা সামলিয়ে ভক্তি প্রচার ও কাব্য করতে থাকেন। তাঁরা সম্প্রদায়ের একটি নৈতিক বোধ গড়ে তুলছিল।

চলো আলোচনা করি।

পন্ডরপুরের বারী বিষয়ে আরও তথ্য খুঁজে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা করো।

- *বারকরীরা* কোন মাসে *ওয়ারী* যায়?
- *বারকরীর* পরিকল্পনা কিভাবে করা হয়?

রামদাস স্বামী : রামদাস স্বামী মারাঠাবাড়ার জাম্ব নামক গ্রামে বাস করতেন। তিনি বল উপাসনার

गুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

মরাঠী তিতুকা মেড়বাবা।

মহারাষ্ট্র ধর্ম বাঢ়বাবা।।

এই তাঁর দ্বারা দেওয়া একটি বিখ্যাত বার্তা। তিনি দাসবোধ, করুণাষ্টক, মনাচে শ্লোকের মতো সাহিত্যের মাধ্যমে জনসাধারনকে বাস্তব শিক্ষা দিয়েছেন। জনগনের আন্দোলন ও গনসংগঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। সমর্থ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন। চাফল এই স্থান এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ছিল। ভগবান

রামদাস স্বামী

রাম এবং হনুমানের উপাসনার প্রসার করেছেন। তিনি তাঁর বিচার (ধারনা) প্রসারের জন্য অনেক ভ্রমন করেছেন।

পরতন্ত্রে স্বাধীনতার প্রেরনা : শিবপূর্বকালে মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি পরিস্থিতি সাধারণত এরকম ছিল। এই সময়কালে মহারাষ্ট্র আদিলশাহী এবং অন্যান্য শাসনতন্ত্রের অধীনে ছিল। অতএব মহারাষ্ট্র স্বাধীন ছিল না। তারপরও কিছু ব্যক্তি ও মতাদর্শ স্বাধীনতার স্পপ্ন দেখেছিল। এর মধ্যে স্বরাজ্যের সংকল্পনা প্রতিষ্ঠীতা হিসাবে শাহাজি রাজার স্থান অগ্রনী ছিল।

অনুশীলনী

১. নিচের তালিকা পূরণ করো ।

	গ্রাম (মৌজা)	*কসবা*	*পরগনা*
কাহাকে বলে	....	....	....
অধিকারী	....	....	....
উদাহরণ	....	....	....

২. কাহাকে বলে ।

(১) বুদ্রুক -

(২) পরজা -

(৩) বতন –

৩. সন্ধান করে লেখো।

(১) কোঙ্কনের উপকুলে আফ্রিকার থেকে আসা মানুষ –

(২) 'অমৃতানুভব' গ্রন্থের লেখক –

(৩) সাধক তুকারামের গ্রাম –

(৪) *ভারুদার* স্রষ্টা –

(৫) বলউপাসনার ব্যাখ্য করে –

(৬) মহিলা সধ্বীদের নাম –

৪. নিজের ভাষার তথ্য ও কাজ লেখো।

(১) সাধক নামদেব (২) সাধক জ্ঞানেশ্বর

(৩) সাধক একনাথ (৪) সাধক তুকারাম।

৫. খরা (অকাল) কেন প্রজাদের জন্য একটি বড় সমস্যা ছিল?

উপক্রম

(১) তুমি কিভাবে বারকরীদের (বারকারী) সাহায্য করবে তার একটি পরিকল্পনা লেখ।

(২) বিবিধ সাধকদের পোশাক পরিধান করো ও তাঁদের কবিতা পরিবেশন করো।

৫. *স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠা

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ মহারাষ্ট্রে এক যুগোপযোগী ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। এখানকার অন্যায়কারী রাজাদের অত্থান করে তিনি *স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৫৫১ শকে ফাল্গুন বদ্য তৃতীয় অর্থাৎ ১৯ই ফেব্রুয়ারী ১৬৩০ সালে পুনে জেলার জুন্নারের কাছে শিবনেরি দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর দ্বারা *স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জেনে নেবো।

তুমি জানো কি?

জাহাগীর - *জাগীর* অর্থাৎ যে কোনো একটা প্রদেশের আয় বা রাজস্ব সংগ্রহ এবং তা ভোগ করার অধিকার যারা শাসকদের সেবায় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের নগদ আকারে বেতন না দিয়ে, বেতনের আয় হিসেবে, আয়ের সমান পরিমান পাবে এত ভূখণ্ড দেওয়া হয়ে ছিল। তাকে ‘জাহাগীর’ বলা হতো।

শাহাজী রাজে : শিবাজী মহারাজের পিতা শাহাজী রাজে ছিলেন দক্ষিনের একজন শক্তিশালী সরদার। মুঘল শাসক নিজামশাহ দখলের অভিয়ান প্রচালন করে। এই অভিয়ানে বিজাপুরের আদিলশাহ মুঘলদের সাথে সহযোগিতা করেন। শাহাজীরাজার মনোভাব ছিল যে মুঘলরা যেন দক্ষিনে প্রবেশ না করে। তাই তিনি মুঘলদের প্রবল বিরোধিতা করে নিজামশাহীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আদিলশাহীর ক্ষমতার কাছে তিনি টিকতে পারলেন না। ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে নিজামশাহী উৎখাত ও ধ্বংস হয়েছিল। নিজামশাহীর অস্তিত্ব অবসানের লার, শাহাজী রাজে বিজাপুরের আদিলশাহীর প্রধান সরদার হন। শাহাজী রাজার অধিপত্যে ভিমা ও নিরা নদীর মাঝে পুনে, সুপা, ইন্দপুর ও চাকন পরিষদের ভাগির ছিল। আদিলশাহ এই জাগিরের মুল প্রদেশ শহাজীরাজার কাছেই রাখলেন। এবং এর সাথে-সাথে তাঁকে জাহাগীর হিসেবে কর্নাটকের আশে-পাশে ব্যাঙ্গলোর অঞ্চলও দিয়েছিলেন।

শাহাজি রাজে

শাহাজী রাজা ছিলেন একজন পরাক্রমশালী, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান এবং মহৎ রাজনীতিবিদ। তিনি একজন মহান তীরন্দাজ ছিলেন। এছাড়াও তিনি তলোয়ার, পাট্টা ও বর্শা চালানোয় পারদর্শী ছিলেন। প্রজাদের তিনি খুব ভালবাসতেন। মহারাষ্ট্র কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর অনেক প্রদেশ তিনি জয় করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে তার একটা বড়ো জোর ছিল। শিবরায় এবং জিজাবাই যখন বেঙ্গালুরুতে ছিলেন তখন শিবরায়কে রাজা হওয়ার উপযুক্ত সেরা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদেশী শাসন উৎখাত করে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার প্রবল ইচ্ছা তাঁর মনে ছিল। তাই তাঁকে স্বরাজ্যের সংকল্পক বলা হয়। তিনি শিবরায় এবং জিজাবাইকে অনুগত ও কর্তব্যপরায়ন সঙ্গীসহ ব্যাঙ্গলোর থেকে পুনে পাঠান।

বীরমাতা জিজাবাই : জিজাবাই ছিলেন বুলঢানা জেলার সিন্দখেড় রাজার পরাক্রমী সরদার লখুজী রাজে জাধবের কন্যা। শৈশবে তাকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার সাথে-সাথে শৈনিকী শিক্ষাও দেওয়া হয়। শাহাজী মহারাজের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যেন সত্যি হয়, তাই তিনি তাকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করতেন। এবং সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন, একজন কর্তব্যপরায়ন ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে শিবরায়কে নিরন্তর পথ দেখান প্রজাদের সমস্যা সমাধানে উপলক্ষ্যে উচিৎ ন্যায় কাজও তিনি করতেন। শিবরায়কে

বিরমাতা জিজাবাই

উত্তম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন। তিনি শিবাজী মহারাজকে সত্যবাদিতা, বিনয়, বাগ্মিতা, ধৈর্য, সতর্কতা, অস্ত্রের ব্যবহার, বিজয়ের আকাঙক্ষা, স্বশাসনের স্বপ্ন ইত্যাদির মূল্যবোধ জাগিয়ে ছিলেন।

শিবাজীর সহযোগী : শিবাজী মহারাজ মাওয়াল এলাকায় *স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। মাওয়াল বর্তমান পুনে জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ। মাওয়াল পাহাড়ী, উপত্যকা ও দুর্গম অঞ্চল। মাওয়ালের এই ভৌগোলিক অবস্থানকে মহারাজ *স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে ছিলেন। তিনি জনগণের মনে আত্মীয়তার অনুভূতি জাগিয়ে ছিলেন। স্বরাজ্যের এই কাজে তিনি ভালো সহযোগী ও সহকর্মী পেয়েছিলেন। য়েসাজি কঙ্ক, বাজী পসলকর, বাপুজী মুদ্গল, নরহেকর দেশপান্ডে বন্ধু, কাভজী কোন্ডাড়কর, জিভা মহালা, তানাজী মালুসরে, কানহোজী জেধে, বাজিপ্রভু দেশপান্ডে, দাদাজী নরসপ্রভু দেশপান্ডে এই তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন। এই সহকর্মীদেরে শক্তিতে তিনি স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ হাতে নেন।

মনে রাখবে -

বারো মাওয়ালঃ (১) পবন সাভাল (২) হিরডস মাওয়াল, (৩) গুঞ্জনা মাওয়াল (৪) পৌড় খোরে (উপত্যকা) (৫) মুঠে উপত্যকা (৬) মুসে উপত্যকা (৭) কানাদ উপত্যকা (৮) ভেলভান্দ উপত্যকা (৯) রোহিদ উপত্যকা (১০) অন্দর মাওয়াল (১১) নানে মাওয়াল (১২) কোরাবারসে মাওয়াল।

শিবাজী মহারাজের পুণে *জাহাগিরির* সহ্যাদ্রির পর্বতের অঞ্চলকে মাওয়াল উপত্যকা বলা হয়। একে ‘বারো মাওয়াল’ ও বলা হয়

করে দেখা

জিভা মহালা, তানাজী মালুসরে, বাজিপ্রভু দেশপান্ডে এবং তার সহযোগীদের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করো।

রাজমুদ্রা

রাজমুদ্রা: *স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠার পেছনে শিবাজী মহারাজের লক্ষ্য ছিল, এটা তাঁর *(রাজমুদ্রা)* থেকে স্পষ্ট হয়। এই শিলামোহরে নিম্নলিখিত সংস্কৃতি পঙ্‌ক্তিগুলি উল্লেখ করা আছে।

প্রতিপশ্চন্দ্র লেখেব বর্ধিষ্ণুবিশ্ববন্দিতা।।

শাহসুনো: শিবশয়িশ মুদ্রা ভদ্রায় রাজতে।।

অর্থ : ‘শাহজীর পুত্র শিবাজী (শুক্ল পক্ষের) যিনি প্রতিপদের অর্ধচন্দ্রের মতো বেড়ে ওঠেন এবং সমগ্র বিশ্ব দ্বারা পুজিত হন, এমনটিই এই রাজমুদ্রা (প্রজাগণের) কল্যানের জন্য সর্বোচ্চ রাজস্ব করে। রাজমুদ্রার এই সুবচনের অর্থ নানাভাবে গুরুত্বপুর্ণ।’

মহারাজ এই প্রতিশ্রুতির জন্য তাঁর পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ছিলেন, এই বিশ্বাস যে স্বরাজ্য অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রসারিত হতে থাকবে। অভিজ্ঞতা, জনগনের কল্যানে অঙ্গীকার, এবং আমাদের ভূমির

উপর স্বাধীন আধিপত্যের নিশ্চয়তা এমন অনেক কিছুই প্রকাশ পেয়েছে।

বুঝে নেবো

- আমাদের দেশের রাজমুদ্রার নিরিক্ষন (পর্যাবেক্ষন করো)
- তাহাতে কি কি দেখতে পাও?
- রাজমুদ্রার ব্যবহার কোথায়-কোথায় করা হয়?

স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন : শিবাজী মহারাজের জাহাগিরির দুর্গগুলি তাঁর নিয়ন্ত্রনে ছিল না, তাহা আদিলশাহীর নিয়ন্ত্রনে ছিল। সেই সময় দুর্গের বিশেষ মহত্ব ছিল। দুর্গের দখলের অর্থ হল আশে-পাশের অঞ্চলগুলিকে নিয়ন্ত্রন করা। 'যার দুর্গ তার রাজ্য' এই অবস্থা ছিল। মহারাজা তাঁর জাহাগিরির দুর্গগুলি দখল করার সিদ্ধান্ত নিলেন দুর্গ দখলের এ ধরনের প্রচেষ্টা আদিলশাহী শাসনকে হুঙ্কার দেওয়ার মতো ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। তিনি তোরন, মুরুম্বদেব, কোণ্ডনা ও পুরন্দর দুর্গ দখল করলেন এবং স্বরাজ্যের উদ্বোধন কবলেন। মুরুম্বদের দুর্গ পুনর্নির্মান করা হয় এবং 'রাজগড়' নামকরন করা হয়। রাজগড় ছিল স্বরাজ্যের প্রথম রাজধানী।

আদিল শাহিতে জাওলির মোরে, মুধোলের ঘোরপড়ে ও সাবন্তবাড়ীর সাবন্ত প্রভৃতি সরদার গন ছিলেন। স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে এই সরদারগন বিরোধ ছিলেন। অতএব এই সরদারগনদের উচিত মার্গে আনা প্রয়োজন ছিল।

রাজগড় কিল্লা - পালী দরজা

জাওয়ালীর উপর দখল : চন্দ্ররাও মোরে ছিলেন সাতারা জেলার জাওয়ালীতে অদিলশাহীর একজন শক্তিশালী প্রধান। তিনি স্বরজ্য প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। তখন ১৬৫৬ খ্রিষ্ঠাব্দে শিবাজী মহারাজ জাওয়ালীর উপর আক্রমন করে ওই অঞ্চলটি জয় করেন। সেখানে তিনি তাঁর কেন্দ্র তৈরী করেন। তারপর রায়গড় জয় করেন। কোকনে জাওয়ালীর বিশাল সম্পদ তার হাতে পড়ল। এই জয়ের পর কোকনে তাঁর আনাগোনা বেড়ে যায়। তিনি জাওয়ালীর উপত্যকায় প্রতাপ গড় দুর্গ নির্মান করেন। এই জয় সর্বদিক দিয়ে তাঁর শক্তি বাড়িয়ে দেয়। শিবাজী মহারাজ তরপর কল্যান ও ভিওয়ান্ডি জয় করেন। ফলস্বরূপ পশ্চিম উপকুলে সিদ্দি, পর্তুগিজ এবং, ইংরেজ শক্তির সাথে তার মন-মালিন্য হয়। এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে, আমাদের শক্তিশালী নৌবাহিনী তৈরী করতে হবে এটা তিনি বুঝতে পারলেন এবং এই কারনেই তিনি নৌবাহিনী নির্মানের দিকে মনোযোগ দিলেন।

আফজালখানের ধ্বংস: শিবাজী মহারাজ তাঁর জাহাগিরি এবং তাঁর আশে-পাশের আদিলশাহী অঞ্চলের দুর্গ নিতে শুরু করেন। জাওয়ালী মোরেদের বিরোধিতা চুর্ন করেছিলেন। কোকন উপকুলে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে জোর হয়েছিল। এই সবই ছিল যেন আদিলশাহীর জন্য আহ্বানপূর্ন। ওই সময় আদিলশাহির শাসন ব্যবস্থা বড় সাহিবিন দেখাশোনা করত। শিবাজী মহারাজের দমন করা উচিৎ এমন সে ভাবতে লাগল। তাই তিনি আদিলশাহির বলশালী ও অনুভবী সরদার অফজ লখানকে শিবাজী মহারাজকে দমন করার জন্য যেতে বলেছিল। অফজলখান বিজাপুর থেকে বাই এখানে আসে। তার বাই প্রান্তের বিষয়ে ভাল জানা ছিল।

বাইয়ের কাছে প্রতাপগড় দুর্গের পাদদেশে শিবাজী মহারাজ এবং আফজাল খান ১৬৫৯ খ্রিষ্টিব্দে ১০ই নভেম্বরে মিলিত হন। এই মুহূর্তে আফজাল খান শিবাজী মহরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করে, যে কারনে শিবাজী মহারাজ তাকে হত্যা করে আদিলশাহী বাহিনীকে পরাজিত করেন।

অফজালখানকে হত্যার পর মহারাজা যুদ্ধের আহত সৈন্যদের ক্ষতিপুরন দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে যারা ভাল বিরতা দেখিয়েছেন তাদের পুরস্কৃত করেছেন। আফজাল খানের সেনাবাহিনীর যে সৈনীকদের মহারাজ বন্ধি বানিয়েছিলেন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন।

সিদ্দী জোহরের আক্রমন : আফজাল খানের মৃত্যুর পর মহারাজ আদিলশাহীর বসন্তগড়, পান্হাল ও খেলনা দুর্গ জয় করেন। খেলনা দুর্গের নাম তিনি ‘বিশালগড়’ দেন।

মহারাজকে সায়স্ত করার জন্য আদিলশাহ ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে সিদ্দী জোহর এই কুরনুল প্রদেশের প্রধানকে আক্রমন করতে বললেন, তাঁকে ‘সলাবত খান’ এই উপাধি দিলেন। সিদ্দি জোহরকে সাহায্য করেছিলেন রুস্তম-ই-জামান, বাজী ঘোরপড়ে এবং আফজাল খানের ছেলে ফজলখান। এই অবস্থায় শিবাজী মহারাজ পান্হাল দুর্গে আশ্রয় নেন। প্রায় পাঁচ মাস পর্যন্ত সিদ্দির সৈনিক পান্হাল দুর্গ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। মহারাজের পক্ষে অবরোধ থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল। নেতোজী পালকর বাইরে থেকে সিদ্দির সেনাবাহিনীকে আক্রমন করোছিলেন, কিন্তু তার সেনবাহিনী অল্প থাকায় সে চেষ্টায় সফল হয়নি। সিদ্দি অবরোধ সরাবে এমন কোন লক্ষন দেখা যায়নী। তাই মহারাজ সিদ্দির সঙ্গে কথা-বার্তার প্রয়োজন মনে করলেন। ফলে পান্হালগডের অবরোধ শিথিল হয়। এবং এই শিথিলতার লাভ মহারাজ পায়।

এই প্রসঙ্গে দুর্গ থেকে শিব কাশিদ নামে এক শক্তিশালী যুবক সম্মুখে আসে তাকে শিবাজী মহারাজের মতোই দেখা যেত। তিনি শিবাজী মহারাজের পোশাক পরে পালকিতে বসেন, রাজদিন্ডি দরজা থেকে পালকি বেরিয়ে এল। সিদ্দির সেনাবাহিনী পালকি দখল করল। এই ঘটনাটি বড়ই অসামান্য ছিল। শিবা-কাশিদ এই প্রসঙ্গে স্বরাজ্যের জন্য আত্মত্যাগ করলেন। এদিকে শিবাজী মহারাজ আর একটি কঠিন পথ দিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। তার সাথে বাজিপ্রভু দেশপান্ডে এবং বান্দল দেশমুখ সহ নির্বাচিত সৈন্যরা ছিলেন।

শিবাজী মহারাজ পান্হাল গড়ের থেকে বেরিয়ে বিশালগড়ের দিকে যাত্রা করেন, সিদ্দী জোহর এই খবর জানতে পারল। তার সেনাবাহিনী তাঁদের তাড়া করল। শিবাজী মহারাজ বিশালগড়ের পাদদেশে সিদ্দির বাহিনীকে থামানোর দায়িত্ব বাজিপ্রভু দেশপান্ডেকে অর্পন করলেন। বাজিপ্রভু গজপুরের কাছে ঘোড় খিন্ডিতে সিদ্দির বাহিনীকে থামিয়ে দেয়। বাজিপ্রভুর পরাক্রমের অন্ত ছিলনা, কিন্তু এই সংগ্রাম তিনি বিরত্বপুর্ন মৃত্যুবরন করেন।

তাঁর সেনাবাহিনী সিদ্দীর বাহিনীকে থামিয়ে রাখে। যার ফলে মহারাজের বিশালগড়ে যাওয়ার সম্ভব হয়েছিল বিশালগড়ে যাওয়ার পথে তিনি পাল ওয়ানের দড়বী ও শৃঙ্গপুরের সুর্বে এই আদিলশাহীর প্রধানদের বিরোধিতা চুর্ন করেছিলেন। তারপর নিরাপদে বিশালগড়ে পৌছে যায় শিবাজী মহারাজ।

মহারাজ পান্হালগড়ে অবরোধ আটকে পড়েছিলেন, ওই সময় দিল্লির সিংহাসনের সম্রাট ঔরঙ্গজেব মুঘল সর্দার শাঁয়েস্তাখানকে দক্ষিনে পাঠান তিনি পুনে প্রান্তে আক্রমন করেছিলেন। সেই সময় শিবাজী মহারাজ ও আদিলশাহের লড়াই শুরু ছিল এমন সময় একই সঙ্গে দুই শত্রুর সাথে লড়াই করা ঠিক হবে না, এটা শিবাজী মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন। অতএব, বিশালগড়ে পৌছে তিনি নিরাপদে আদিলশাহের সাথে একটি চুক্তি করলেন। এই চুক্তি, অনুসারে তাঁকে পান্হাল দুর্গ ফিরিয়ে দিতে হল। এখানে শিবাজী মহারাজের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি পর্যায় সম্পন্ন হয়েছিল।

অনুশীলনী

১. সমুহ থেকে বিসংগত শব্দ খোঁজো।

(১) পুনে, সুপে, চাকন, ব্যাঙ্গলোর

(২) ফলটনের জাধব, জাবলীর মোরে, মুধোড়ের ঘোরপড়ে, সাবন্তবাডীর সাবন্ত।

(৩) তোরনা, মুরুম্বদেব, সিংহগড়, সিন্দদুর্গ

২. চলো লিখি:

(১) শিবাজী মহারাজের উপর বীরমাতা জিজাবাই কর্তৃক বিভিন্ন সংস্কার লেখো।

(২) শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্য স্থাপনার সূচনা (কাজ) মাওয়াল এলাকা থেকে শুরু করে।

৩. শিবাজী মহারাজের বন্ধু এবং সহকর্মীদের একটি তালিকা তৈরি করো

৪. খোঁজো এবং লেখো।

(১) শাহাজী রাজাকে স্বরাজ্য সংকল্প বলা হয় কেন?

(২) শিবাজী মহারাজ কেন বর্ম তৈরিতে মনোযোগ দিল?

(৩) শিবাজী মহারাজ আদিলশাহের সাথে চুক্তি কেন করলো।

(৪) শিবাজী মহারাজ কিভাবে পানহালগড় থেকে পালালেন।

উপক্রম

(১) যে দুর্গটি তুমি দেখেছো তার বর্ণনা করো এবং কিভাবে একটি ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ করতে কিছু পরামর্শ বলো।

(২) জমির ‘সাত/বারো’ (৭/১২) প্রতিলিপি পেয়ে পাঠ্যের শব্দের মধ্যে সম্পর্ক বুঝে নাও।

পানহাল দূর্গের তিনটি দরজা

৬. মোগলদের সাথে দ্বন্দ্ব

এখনও পর্যন্ত শিবাজী মহারাজ আদিলশাহের সাথে সফলভাবে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু *স্বরাজ্য* সম্প্রসারিত হওয়ায় মুঘলদের সাথে দ্বন্দ্ব অনিবার্য ছিল। *স্বরাজ্য* প্রসারিত হতেই স্বরাজ্যের উপর মুঘলদের সংকট এসে পড়লো। মহারাজ এই সংকট কাটিয়ে উঠলেন। মুঘলদের কাছ থেকে নিজেদের দুর্গ এবং অঞ্চল উদ্ধার করলো। নিজেই রাজ্যভিষেক করে নিলো। দক্ষিণের অভিযান হাতে নিল।

বলো তো দেখি!

- সুরাট শহরে যেতে চাও তাহলে একটি মানচিত্রের সাহায্যে কিভাবে যাবে সেটি দেখাও।
- শিবাজী মহারাজ কিভাবে সুরাটে পৌছালো তার কল্পনা করো।

শায়িস্তাখানের আক্রমন: ফেব্রুয়ারী ১৬৬০ শায়িস্তাখান অহমদনগর ছেড়ে পুনে আসলো। তিনি রাজ্যের আশে-পাশের অঞ্চলে সেনার ছোট-ছোট টুকরো পাঠিয়ে স্বরাজ্যের মারাত্মক ক্ষতি করলো। কোনো দুর্গ অবরোধ করলো। ফিরঙ্গোজিনরসালা চাকন দুর্গের দুর্গ রক্ষক তিনি তাদের সেনার কঠোরভাবে বিরোধ (প্রতিহত) করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি চাকন দুর্গ জয় করলো।

শিবাজী মহারাজের শৈশব যেখানে কেটেছে পুনের লাল মহলে (প্রাসাদে) শায়িস্তাখান বসেছিল। সেখান থেকে আশে-পাশের এলাকার লুট করতে থাকে। এইভাবে দুই বছর হয়ে গেলো তার পরে ও তিনি পুনে ছেড়ে যাওয়ার বিচার করেনি। যার ফলাফল প্রজার নৈতিকতার উপর হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মহারাজ সাহসী পরিকল্পনা করলেন।

শিবাজী মহারাজ নিজের নেতৃত্বে লাল মহলে সাহস করে একটি গোপন অভিযান চালায়। সেই অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের ৫ই এপ্রিল মহারাজা বাছাইকৃত সৈন্য নিয়ে রাতে লাল মহলে অভিযান চালায়। এই অভিযানে শায়িস্তাখানের আঙুল কেটে গেল। তার অসম্মান হল। তিনি পুনে ছেড়ে ঔরঙ্গাবাদে থাকতে লাগলো। এই কারনে ঔরঙ্গজেব ক্ষুব্ধ হন। ঔরঙ্গজেব তাকে বাংলায় পাঠালো। শায়িস্তাখানের উপর সফল হামলার কারণে জনগনকে প্রভাবিত করে। শিবাজী মহারাজের কর্তব্য দেখে প্রজাদের বিশ্বাস অধিক বৃদ্ধি পেল।

সুরাটে আক্রমন : শায়িস্তাখান তিন বছরে বেশিরভাগ অঞ্চল ধ্বংস করে ফেলে। তার ক্ষতিপূরণ করা প্রয়োজন ছিল। এই জন্য মহারাজ মুঘলদের শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করলো। মুঘলদের দখলে সুরাট একটি বড় ব্যবসাহিক কেন্দ্র এবং বন্দর ছিল। সেখানে ইংরেজ, ডাচ এবং ফরাসিদের বাখারি ছিল। এই শহর বাদশাহার সবচেয়ে বেশি কর (রাজস্ব) দিচ্ছিল। তেমনি আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ায় তিনি সুরাটে আক্রমন করে। সুরাটের সুবেদার ইনায়েতখান মহারাজের প্রতিরোধ করতে পারেনি। সামান্য প্রজার কষ্ট না দিয়ে তিনি সুরাট থেকে প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করে। তার এই অভিযান সফল হল। এটা ছিল ঔরঙ্গজেব বাদশাহার সুনামের ওপর আঘাত।

জয়সিংহের আক্রমন : ঔরঙ্গজেব মির্জা রাজা জয়সিংহকে শিবাজী মহারাজের প্রভাবী আন্দোলনের দেখা-শোনার জন্য তার অভিজ্ঞ এবং মাতব্বর রাজপুত সরদার পাঠিয়েছিল। সে পুনায় আসলো। তিনি মহারাজের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি সংঘটিত করতে চেষ্টা শুরু করলো। গোয়া ও বাসাইয়ের পর্তুগীজ ব্যাঙ্গলোরের ডাচ, সুরাটের ইংরেজ, জঞ্জিরার সিদ্দী তিনি মহারাজের বিরুদ্ধে বর্ম অভিযান চালাতে হবে, এমনটা জয়সিংহ তাহাকে বললো।

শিবাজী মহারাজার কাছ থেকে দুর্গ জিতে নেওয়ার পরিকল্পনা করলো। স্বরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মুঘল সৈনিকের সমূহ পাঠানো হল। সেই সৈনিক স্বরাজ্যের ভূখণ্ডের অনেক ক্ষতি করলো। মহারাজ মুঘলের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলো। মির্জা রাজা জয়সিংহ এবং দিলের খান পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করলো। পুরন্দর দুর্গ অবরোধের সময় মুরারবাজী দেশপান্ডে শক্তির বাজি রাখলো। কিন্তু তিনি বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুবরন করলো। পরিস্থিতির গুরুতরতা বিবেচনা করে, মহারাজ জয়সিংহের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি জয়সিংহের সাথে দেখা করলো। জয়সিং এবং মহারাজার মধ্যে জুন ১৯৬৫ সালে সন্ধি হলো। এই সন্ধি পুরন্দর সন্ধি নামে জানা যায়। এই সন্ধি অনুসারে মহারাজ মুঘলদের ২৩ (তেইশ)টি দুর্গ এবং তার

তথ্য সংগ্রহ করো।

শিবাজী মহারাজ আগ্রা থেকে আওরঙ্গজেবের বন্দীর চোখ থেকে কিভাবে পালালো তাহার তথ্য সংগ্রহ করোন।

চারিপাশের বাৎসরিক চার লক্ষ উৎপন্নের ভূখণ্ড দিলো। তিনি আদিলশাহীর বিরুদ্ধে মুঘলদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিলো। এই সন্ধিকে ঔরঙ্গজেব মঞ্জুরি দিলো।

আগ্রা পরিদর্শন এবং মুক্তি : পুরন্দরের সন্ধির পরে জয়সিংহ আদিলশাহীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলো। মহারাজ জয়সিংহের সাহায্য করলো তারপরেও তার এই অভিযান সফল হল না। সেই সময় মহারাজার কিছু সময় দক্ষিণের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুক, এই বিচার জয়সিংহ এবং ঔরঙ্গজেব বাদশাহ করলো। এই বিচার অনুসারে জয়সিংহ মহারাজার বাদশাহের কাছে দেখা করতে যাবে। এই প্রস্তাব তার সামনে রাখলো। তার নিরাপত্তার কথা বললো। সেই অনুসারে শিবাজী মহারাজ। আগ্রার জন্য বের হলেন। সাথে রাজপুত্র সম্ভাজী ছিল। পাশাপাশি অনুগত এবং জীবনদানকারী নির্বাচিত সহকর্মী ছিল।

মহারাজ আগ্রায় পৌচালেন। কিন্তু দরবারে মহারাজের উচিৎ সম্মান দিল না। যার কারণে মহারাজ রাগ প্রকাশ করলো। তার পরে বাদশাহ তাকে নজর বন্দি রাখলো। বাদশাহের এই কর্মে বিচলিত না হয়ে মহারাজ নজর বন্দি থেকে নিজের রক্ষার পরিকল্পনা করলেন। তিনি আগ্রা থেকে শিতাফিনে পালিয়ে যান এবং কিছু দিন পরে নিরাপদে মহারাষ্ট্রে পৌছালেন। আগ্রা থেকে আসার সময় সম্ভাজী মহারাজাকে মথুরায় রাখা হয়েছিল। পরে ওনাকে নিরাপদে রাজগড়ে আনা হল। মহারাজ স্বরাজ্য থেকে দুরে থাকা কালে স্বরাজ্যের কাজকর্ম বীরমাতা জিজাবাই এবং মহারাজের সহকর্মী পরিচালনা করতেন।

মুগলের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক পবিত্র: যদিও মহারাজ মুঘলের সাথে তাৎক্ষনিক সংঘর্ষ চাননি কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল পুরন্দরের অধীনেতাকে দেওয়া দুর্গ এবং অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করা তারজন্য তিনি একটি ব্যাপক ও সাহসিক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। একদিকে বিভিন্ন দূর্গে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে সৈন্য পাঠালেন। দুর্গগুলো নেওয়ার জন্য অন্য দিকে দক্ষিণাত্যে মুঘলদের প্রভাবশালী অঞ্চলে আক্রমন করে বিচলিত রাখা। সেই ধারণা ছিল। সেই অনুসারে তিনি মুঘলদের আহ্মদনগর এবং জুন্নর এই অঞ্চলে আক্রমণ করলেন। আগে-একেরপর এক সিংহগড়, পুরন্দর, লৌহগড়, মাহুলী কর্নালা এবং রোহিড়া এই দুর্গ জিতে নিলেন।

তারপরে শিবাজী মহারাজ দ্বিতীয়বার সুরাটের উপর আক্রমন করলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার সময় নাশিক জেলার বনী দিংডোরী স্থানে মুঘলের সাথে ভিষণ সংঘর্ষ হলো। এই লড়াইয়ে তিনি দাউদখান এই মুঘল সরদারকে পরাজিত করলেন। এরপর মোরোপন্ত পিঙ্গলে তিনি নাশিকের কাছে ত্রিম্বক দুর্গ জয় করলেন।

এভাবে মহারাজ মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধনিতিতে সফল হয়। এই আরোহনের(যুদ্ধের)মহিমায় তানাজী মালুসরে, মরোপন্ত পিঙ্গলে, প্রাতাপ রাও গুজর ইত্যাদি সরদাররা মূল্যবান কর্মসমতা করলো। এই মহিমার বর্ণনা কৃষ্ণজী অনন্ত সদস্য এই বাখর করনে নিম্নরূপ করলো চারমাসে সাতাশটি দুর্গ নিয়েছিল অনেক বড় নাম হল। এনার হাতে রায়গড়ে নিজের রাজ্যভিষেক করে নিলেন।

এই রাজ্যভিষেকের মাধ্যমে মহারাজ এখন স্বরাজ্যের ছত্রপতি হলেন। সার্বভৌমের প্রতীক তার জন্য তিনি 'রাজ্যভিষেক শক' এই নতুন দিনদর্শিকা শুরু করলেন। সেটি এখন সফল হলো। রাজ্যভিষেক প্রসঙ্গে তিনি সোনার 'হোন' এবং তামার 'শিবরাই' এই বিশেষ

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ

রাজ্যভিষেক : ত্রিশ বছরের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে মারাঠাদের স্বরাজ্য (স্ব-শাসন বাস্তবায়িত হলো। তবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বাধীন ও সার্বভৌম, এটি স্পষ্ট করার জন্য স্বরাজ্যের অনুমোদন এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন, বিষয়টি মহারাজের নজরে এলো। এর জন্য যথার্থ রাজ্যভিষেকের প্রয়োজন ছিলো। এইজন্য তিনি ৬জুন ১৬৭৪ এই দিনে বিদ্বান পণ্ডিত গাগাভট্ট মুদ্রার প্রচলন শুরু করেছিলেন। এই মুদ্রার উপরে শ্রী রাজা শিবছত্রপতী এই অক্ষর ছাপা(লেখা) হলো। সেখান থেকে রাজপত্রে ক্ষত্রিয়কুল - বংশ শ্রী রাজা শিবছত্রপতী এমনটা উল্লেখ শুরু হলো, তিনি ফারসি - শব্দের বিকল্প হিসেবে সংস্কৃত শব্দ থাকা একটি অভিধান তৈরি করে নিলো। একেই রাজ্য ব্যবহার অভিধান বলে।

দুর্গ রায়গড়ে

একটু মনে করো?

কোন ভারতীয় রাজা নতুন দিনদর্শিক। শুরু করেছিলেন?

মনে রেখো-

রাজ্য ব্যবহার (রাষ্ট্রীয়) লেনদেনের বাক্সে কিছু সমার্থক শব্দ উল্লেখযোগ্য আছে।

উদা - বই-পদবী, ফর্মান রাজপত্র
জমিন - প্রতিভূতি, সম্মতি বর্তমানে
মাজী - পূর্ব, এখন - তাৎক্ষনিক
বিন্দাবন - উত্তম,
বকুব - প্রজ্ঞা, বেবকুফ (বোক) - বোকা,
দস্তপোশী (ডায়রিয়া) হাতের স্পর্শ,
সাক্ষাৎকার - দর্শন কদমপোশী - পাদস্পর্শ,
ঝুঁট - মিথ্যা কৌলনামা - অভয়,
ফতেহ - বিজয়, ফির্যাদ - অন্যায়বার্তা,
শিলেদার - স্বংতুরগী

শিবাজী মহারাজের রাজ্যভিষেক মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এই ঘটনার মহত্ব সদস্য বলে, মরাটা পাতশাহ ছত্রপতি জালা এই গল্প সাধারন হয়ে উঠেনি।

এরপরে, মহারাজ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৬৭৪ সালে নিশ্চলপুরী গোসাবী এনার নির্দেশনায় প্রযুক্তিগতভাবে রাজ্যভিষেক করে নিলেন। ভারতে বৈদিক এবং প্রযুক্তি(তান্ত্রিক) এমন ধর্মপালনকারী দুইটি ঐতিহ্য অস্তিত্বে ছিল। তাদের আদর করে মহারাজ এই দুই পদ্ধতিতে রাজ্যভিষেক করে নিলেন।

তুমি জানো কি?

শিবাজী মহারাজের রাজ্যভিষেকের সময় যুবরাজ সম্ভাজীর বয়স ১৭ বছর ছিল। তিনি বুধভূষন গ্রন্থে রাজ্যভিষেকের অনুষ্ঠানের বর্ণনা করেছে। সেটা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আছে।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজার রাজ্যভিষেক মহাউৎসবের সময়, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সকল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এসেছিল, তাদের ওজন মাপ কিংবা মোজদাদ না করে বিপুল ধন দিয়ে সাথে-বস্তু, হাতী, ঘোড়া এরও দান করে সন্তুষ্ট করা হলো।

এইভাবে ছত্রপতি শিবরায়ের নিজের খ্যাতি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হলো।

তুমি জানো কি?

শিবাজী মহারাজার রাজ্য ভিষেকের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও বিশাল সিংহাসন তৈরি করা হল সিংহাসনের আট দিশায় আটটি রত্নজড়িত স্তম্ভ ছিল। বত্রিশ *'মন'* সোনার এই সিংহাসন মূল্যবান রত্ন জড়িত ছিল।

- *'মন'* এই একক গণিতের শিক্ষকের নিকট হইতে বুঝে নাও।

দক্ষিণে অভিযান : রাজ্যভিষেকের প্রায় তিন বছর পর, অক্টোবর ১৬৭৭ সালে মহারাজা দক্ষিণে অভিযান পরিচালনা করে, গোবড়কোন্ডাস তিনি কুতুবশাহার দেখা করে তার সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করে। পরবর্তী মহারাজ

কর্ণাটকের ব্যাঙ্গলোর, হোসকোটে, পাশাপাশি বর্তমানের তামিলনাড়ুর জিঞ্জি, বেল্লোর ইত্যাদি দুর্গ এবং আদিলশাহের অন্য কিছু অঞ্চল জিতে নিলো। তার সৈন্য সেখানকার প্রজার কোনো কষ্ট দেই নাই। বিজিত (জেতা) অঞ্চলের কাজকর্ম দেখার জন্য প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রঘুনাথ নারায়ন হনমন্তে তাকে নিয়োগ করেন। শিবাজী মহারাজের সৎ ভাই ব্যাঙ্কোজি বর্তমানের তামিলনাড়ুতে থাকা তাঞ্জাবর এখানে রাজ্য করতো। তাকে নিজের স্বরাজ্য কার্যে সহভাগ করে নেওয়া মহারাজার চেষ্টা ছিল। ব্যাঙ্কোজি রাজা এনার পরে তাঞ্জাবকের বিদ্যা এবং কলা এর লালন-পালন করলো। সেখানকার 'সরস্বতী মহাল' এই গ্রন্থলয় বিশ্বপ্রসিদ্ধ।

দক্ষিণের অভিমানের ফলে তামিলনাড়ুর জিঞ্জির দুর্গ জিতে সেটা স্বরাজ্যে মিলানোর শিবাজী মহারাজের পদক্ষেপ পরবর্তী সময়ে একটি নির্ণায়ক মহত্ব পেয়েছিল। মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব স্বরাজ্য নষ্ট করার জন্য মহারাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করে। তখনকার ছত্রপতি রাজারাম মহারাজার নিরাপত্তার জন্য তাকে মহারাষ্ট্র ছাড়তে হয়েছিল সে সময় তিনি দক্ষিণের যিনি দুর্গে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে স্বরাজ্যের বিষয়গুলো চালায়। শিবাজী মহারাজের দক্ষিণ দিগ্বিজয়ের পর অল্প সময়ে তিনি ১৬৮০ সালের ৩ য়া এপ্রিল রায়গড়ে মৃত্যুবরন করে। পঞ্চাশের দশকে তার মৃত্যু স্বরাজ্যের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করে। এক মহান যুগের অস্ত হল।

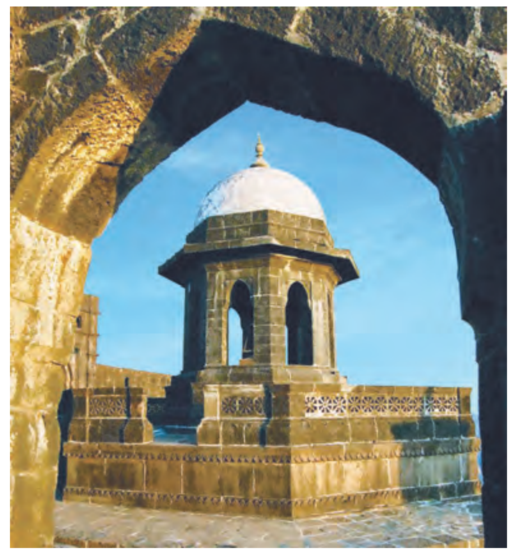

শিবাজী মহারাজের সমাধী রায়গড়

অনুশিলনী

১. নিম্ন ঘটনার কালানুক্রম লেখো।

(১) শিবাজী মহারাজের দক্ষিণ অভিযান
(২) লাল মহলে ছাপা
(৩) আগ্রা থেকে পালিয়ে যান
(৪) রাজ্যভিষেক
(৫) পুরন্দরের সন্ধি
(৬) শাযিস্তাখানের উপর আক্রমন

২. অনুসন্ধান মানে খুঁজে পাওয়া।

(১) সংস্কৃত শব্দ থাকা অভিধান -
(২) এম্বুকদুর্গ জয় -
(৩) বানী ডিন্ডোরিতে পরাজিত প্রধান
(৪) ইংরেজ, উঁচ, ফ্রান্স, এদের বসতি স্থান

৩. নিজের শব্দে লেখো।

(১) শিবাজী মহারাজের রাজ্যভিষেক
(২) আগ্রা থেকে পালিয়ে যান
(৩) শিবাজী মহারাজার দক্ষিণের অভিযান।
(৪) শিবরায় দ্বারা রাজ্যভিষেকের প্রস্তুতি।

৪. কারন লেখো।

(১) শিবরায় পুরন্দর সন্ধি করেছিলো।
(২) শিবাজী মহারাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক অবস্থান নেয়।

উপক্রম

(১) বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস/প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য তুমি কিভাবে প্রস্তুতি নাও। শিক্ষকের সাহায্যে একটি তালিকা তৈরি করো।
(২) নিজের এলাকার একটি ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করে আহবল রিপোর্ট লেখো।

৭. স্বরাজ্যের প্রশাসন

শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের স্থাপন করলেন। নিজে রাজ্যভিষেক করে নিলেন। রাজ্যভিষেকের পরে তিনি দক্ষিণ দিগ্বিজয় করলো। স্বরাজ্যের বিস্তার হল। এই স্বরাজ্যে মহারাষ্ট্রের নাশিক, পুনে, সাতারা, সাংগলী, কোল্হাপুর, সিন্ধুদুর্গ, রত্নাগিরী রায়গড় ও ঠানে এই জেলার অনেক অর্ন্তভুক্ত পাশাপাশি কর্নাটক, আন্ধ্র প্রদেশ এবং তামিলনাড়ু রাজ্যের কিছু ভাগ স্বরাজ্যে সমবিষ্ট হয়েছিল। এই রিতিতে বিস্তারিত হওয়া স্বরাজ্যের প্রশাসন ঠিকভাবে হবে। তাই জনগণের কল্যান নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য মহারাজ স্বরাজ্যের ঘড়ি বেঁধে দেন। আমরা এ বিষয়ে তথ্য জেনে নেবো।

অষ্টপ্রধান মন্ডল: মহারাজ রাজ্যভিষেকের উপলক্ষে অষ্ট প্রধান মন্ডল নিযুক্ত করলেন। রাজ্যশাসনের সুবিধার্থে তাঁর আট খাতায় বিভক্ত করলেন। প্রতিটি খাতার জন্য একজন প্রধান নিযুক্ত করলেন। আট খাতার আট প্রধান মিলে-অষ্ট প্রধান মণ্ডল তৈরি হলো। এই প্রধানদের নিযুক্তি করা কিংবা তাদের পদথেকে দুর করা, এইগুলি মহারাজার অধিকার ছিল। নিজের খাতার পরিচালনার জন্য এটা প্রধান মহারাজার কর্তব্য ছিল।

শিবাজী মহারাজ গুন এবং কর্তব্য দেখে অষ্টপ্রধান মন্ডলের পছন্দ করলেন। তাদের পুরস্কার বা জমি দেওয়া হয়নি। নগদ বেতন অবশ্য অনেক দিয়েছে।

কৃষি বিষয় বাঁধ: কৃষি এটা গ্রামের মুখ্য ব্যবসায় ছিল। মহারাজ কৃষির মহত্ব (গুরুত্ব জানতো, যার কারণে মহারাজ কৃষকের সুবিধার দিকে লক্ষ্য দিলেন। তিনি আন্নাজী দত্ত এই অভিজ্ঞ এবং অনুভাবী (কর্তব্য পরায়ন) অধিকারীর কাছে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা দেওয়া হলো। নির্ধারিত পরিমানের চেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় না করা। কর্তৃপক্ষকে এমন হুঁশিয়ারি দেন। পতিতজমি চাষের আওতায় আনতে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির কারণে বা খরা এই কারণে ফসল হাতের বাইরে গেলে কিংবা শত্রুসেনা গ্রামের অঞ্চল নষ্ট করা। এই সব প্রসঙ্গে গ্রামবাসীর ক্ষেতসারাও অন্য খাজনা মাপ করা হল। এটা মহারাজের আদেশ ছিলো। এই পরিস্থিতিতে কৃষকের গরুর জোড়া, লাঙ্গল এবং বপনের জন্য ভালো বীজ দেওয়া এমনটা তাঁদের অফিসারদের আজ্ঞা ছিলো।

শিবরায়ের অষ্টপ্রধান মন্ডল।

	প্রধানদের	পদ	কাজ
১.	মোরো ত্রম্বক পিঙ্গলে	প্রধান	রাষ্ট্র পরিচালনা এবং জয়করা অঞ্চলের ব্যবস্থা দেখা।
২.	রামচন্দ্র নীলকান্ত মজুমদার	অমাত্য	রাষ্ট্রের হিসাব দেখা শুনা করা।
৩.	আন্নাজি দত্ত	সচিব	সরকারী আদেশ (আজ্ঞা) প্রস্তুত করা।
৪.	দত্তজি এ্যম্বক ওয়ার্কনিস	মন্ত্রী	চিঠিপত্র দেখাশুনা করা।
৫.	হাম্বিররাও মোহিতে	সেনাপতি	সৈন্যর ব্যবস্থা করা ও রাষ্ট্র সংরক্ষণ করা।
৬.	রামচন্দ্র এ্যম্বক ডবীর	সুমন্ত	পর রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রাখতে।
৭.	নিরাজি রাওজি	বিচারক	ন্যায়দান করা।
৮.	মোরেশ্বর পণ্ডিতরাও	পণ্ডিতরাও	ধর্মীয় বিষয়গুলো দেখা।

তৎকালীন (সমসাময়িক) গ্রামের অর্থনীতি : কৃষি ব্যবসা ছিল গ্রামের মেরুদন্ড। গ্রামে কৃষি ব্যবসার পরিপূরক একটি ব্যবসা আছে। গ্রামের কারিগররা পণ্য (বস্তু) তৈরি করে। স্থানিক লোকদের প্রয়োজন মেটায়। এর মানে গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ন ছিল। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল থেকে প্রয়োজনীয় বাটা কারিগরদের দিতো। এই বাটাকে বুলুন্ত বলে।

বানিজ্য ও শিল্প : মহারাজ স্বীকার করেছিল যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ছাড়া রাজ্যের উন্নতি হতে পারে না। বাণিজ্যের কারণে নতুন-নতুন প্রয়োজনীয় বস্তু রাষ্ট্রে আসে। জিনিসের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায়। ব্যপার বাড়ে। সম্পদ বৃদ্ধি হয়। 'সাহকার মানে রাজ্য ও রাজশ্রীর সৌন্দর্য' এই আজ্ঞা পত্রের বর্ণনাটি বানিজ্যের ক্ষেত্রে মহারাজের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির চিত্র তুলে ধরে। 'সাহুকার' এই শব্দের অর্থ ব্যাপারী হয়।

মহারাজের নীতি ছিল স্বরাজ্যের শিল্পকে রক্ষা করা। এর একটি ভালো উদাহরণ হলো লবন (নুন) শিল্প। তিনি কোকনের লবন শিল্পকে রক্ষা করলো। সে সময় পর্তুগিজদের অধিকারে থাকা অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমানে লবন স্বরাজ্যে আমদানি করত। এটি কোকনের স্থানীয় লবন বিক্রির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই কথা মাথায় রেখে মহারাজা পর্তুগিজদের অঞ্চল থেকে স্বরাজ্যে প্রবেশকারী (আসা) লবনের উপর একটি বড় জাকাত (কর) লাগান। পর্তুগিজ থেকে আসা লবন ব্যয়বহুল হয়ে তার আমদানি কম হবে এবং স্থানিক লবনের বিক্রী বেশি হবে, এটাই ছিল উদ্দেশ্য।

সামরিক ব্যবস্থা : মহারাজার সৈন্য (সামরিক বিভাগ দুই ভাগে ছিল। একটি পায়দল এবং দ্বিতীয়টি অশ্বারোহী পায়দলে কনস্টেবল, জুমলেদার এমন একজন অফিসার। পায়দলের প্রধানের সরণোবত বলে। তিনি পায়দলের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ছিল। অশ্বারোহী বাহিনীতে দুই ধরেণের অশ্বারোহী ছিল। এক শিলেদার এবং দ্বিতীয়টি বারগীর। শিলেদারের নিকট নিজস্ব ঘোড়া ও নিজস্ব অস্ত্র ছিল। অন্যদিকে বারগীরদের সরকার হইতে ঘোড়া এবং অস্ত্র দেওয়া হয়। অশ্বরোহী অধিকারীদের শ্রেণী পায়দলের মতন থাকে। 'সরনোবত' এটা অশ্বরোহীদলে সর্বচ্চো অধিকারী ছিল। নেতাজী পালকর, প্রতাপরাও গুজর, হাম্বিররাও মোহিতে এমন কিছু সরনোবত মহারাজার অশ্বারোহী দলে প্রসিদ্ধ ছিল।

জেনে নাও।

ভারতীয় সৈন্য দলের তথ্য সংগ্রহ করো।

- তিনটি সৈন্য দলের নাম বলো।
- প্রত্যেক সৈন্যদলের প্রধানকে কি বলে?
- তিন সৈন্যদলের প্রধান কে থাকে?

হের খাতে (হিসাব) : স্বরাজ্যের শত্রু থেকে সংরক্ষন করা প্রয়োজন ছিল। এরজন্য শত্রুর গতিবিধির সঠিক তথ্য সময়মতো পেতে হবে। এই তথ্য বের করে মহারাজাকে দেওয়ার কাজ হের সাতার নিকট ছিল। তাহার হেরখাতা খুব কার্যক্ষম ছিল। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য আহরনে পারদর্শী ছিল। তিনি সুরত অভিযানের আগে শিলার তথ্য এনেছিল।

দুর্গ : মধ্যযুগে দুর্গের গুরুত্ব ছিল অনন্য। দুর্গ দখলে থাকলে আশেপাশের অঞ্চলের পর্যবেক্ষন এবং নিয়ন্ত্রন করা যেতে পারে। বিদেশী আক্রমণের ক্ষেত্রে দুর্গের আশ্রয় থেকে জনগণকে রক্ষা করা যায়। দুর্গের উপরে অন্ন-ধান্য, যুদ্ধের সাহিত্য, গোলা বারুদ তার সংরক্ষণ করা যেতে পারে। স্বরাজ্য স্থপনার কাজে দুর্গের গুরুত্ব আদেশপত্রে বলা হয়েছে সেটি এমন, 'এই রাজ্য তীর্থরূপ থরলে কৈলাসবাসী স্বামীনে দুর্গ থেকে নির্মাণ করলো।

স্বরাজ্যে প্রায় ৩০০ দুর্গ ছিল। এই দুর্গের নির্মাণ এবং মেরামতের জন্য মহারাজ অনেক ধন ব্যয় করেছিলেন । রাজগড়, প্রতাপগড় পবনগড়, এভাবে পাহাড়ি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। দুর্গের উপর দুর্গদার, সবনীস ও কারখানীস এমন অধিকারী ছিল। সেখানে শস্যভান্ডার এবং যুদ্ধসাহিত্যের ব্যবস্থা দেখার জন্য কারখানিস অধিকারী থাকে।

তুমি জানো কি?

শিবাজী মহারাজার দুর্গনির্মিতী সম্বন্ধে ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজ 'বুধভূষন' এই গ্রন্থে নিম্ননুসার লক্ষণীয় বর্ননা করেছেন।

'কর্নাটক দেশ থেকে বাগলান দেশ পর্যন্ত শত্রুদের অভেদ্য দুর্গ, এমন অনেক দুর্গ ছত্রপতি শিবরায়ানী সাহ্যদ্রি পর্বতের উত্তুংগ শিখর মালভূমির চূড়াতে জাগায়-জাগায় নির্মিতী করেছিলেন তার পিছনের উদ্দেশ্য পৃথিবীর সংরক্ষণ করা ছিল। তার সফল নেতৃত্বে কৃষ্ণ নদীর প্রান্ত থেকে সমুদ্রের চারদিশায় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। রায়রী দুর্গে, বিজয় এবং সর্ব রাজার মধ্যে অগ্রসর এমন রাজা ছত্রপতি শ্রী শিবাজী মহারাজ ছিলেন।

সমুদ্র দুর্গ : মহারাজ সমুদ্র দুর্গের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তার নির্মান করা জলদুর্গের মধ্যে মালবনের সিন্ধু দুর্গ এটা উকৃষ্ট সমুদ্র দুর্গ। দুর্গকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি দূর্গের ভিত্তি স্থাপনের জন্য পাঁচটি খন্ডি সীসার ব্যবস্থা করেছিল। সিদ্দী শাহকে দেবার জন্য তিনি রাজপুরীর সামনে পদ্মাদুর্গ নামক সমুদ্রীক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। নিজের এক চিঠিতে এই দুর্গবিষয়ে তিনি বলেন 'পদ্মদুর্গ বসিয়ে রাজপুরীর উরাভারী দ্বিতীয় রাজপুরী কর।

পদ্মদুর্গ

বর্ম : ভারতের পশ্চিম তীরে গোত্তার পুর্তুগীজ, জাঞ্জিয়ার সিদ্ধি পাশাপাশি সুরাট ও রাজাপুর এখানের ইংরেজরা স্বরাজ্য সম্প্রসরনে বাধা সৃষ্টিকরী শত্রু ছিল। এই বাধা থামানো এবং পশ্চিম উপকূল রক্ষা করা প্রয়োজন ছিলো। এরজন্য মহারাজ বর্ম স্থাপিত করেছিলেন। যারকাছে বর্ম তারসমূদ্র এটা তিনি বুঝলেন। মহারাজ দুরদর্শী ছিলেন।

মহারাজার বর্মে বিভিন্ন ধরনের চারশত জাহাজ ছিলো। এরমধ্যে গুরাব, গলবত এবং পাল এটা লড়াই করা জাহাজ ছিলো। কল্যান ভিওঘান্ডি উপসাগর, বিজয়দুর্গ এবং মালবন এখানে জাহাজ বান্ধা হতো। মায়নাক ভান্ডারী ও দৌলখান এই তার বমের প্রমুখ অধিকারী ছিলো।

গুরাব

গলবত

করে দেখো।

ভারতীয় নৌসেনার লড়াই করা জাহাজের তথ্য সংগ্রহ করো এবং জাহাজের চিত্র সংগ্রহ করো।

প্রজাদের স্বার্থের যত্ন : অন্য রাজার মতো শত্রু অঞ্চল জয় করে এবং সেখানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এত সীমিত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাহারাজ কাজ করেনি। প্রজাদের মুক্ত করা, এটা তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো। প্রজাদের স্বতন্ত্রের সত্যিই আনন্দ পেতে হলে, তাহলে রাজ্যপ্রশাসন শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে, প্রজাদের হিতের সবশেষ যত্ন নেওয়া এবং বিজয়ী অঞ্চল রক্ষা করা। এটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মহারাজ কেবল সত্তাধীন ছিলেন না। তবে প্রজাদের হিতদক্ষ রাজ্যকর্তা ছিলেন। এটা রাজ্য প্রশাসন থেকে স্পষ্ট হয়।

অনুশিলনী

১. চেনো দেখি?

(১) আট খাতার প্রধান -

(২) বহির্জী নাইক এই খাতার প্রধান ছিলেন -

(৩) মহারাজার নির্মাণ করা মালবনের নিকটের জলদুর্গ -

(৪) দুর্গের যুদ্ধসাহিত্য ব্যবস্থা দেখাশোনা করে যে-

২. নিজের শব্দে লেখো।

(১) শিবাজী মহারাজের কৃষি নীতি?

(২) শিবরায়, এক প্রজাহিত দক্ষ্য রাজকর্তা,

৩. কি তাহা বলো।

(১) শিবাজী মহারাজ অষ্টপ্রধান মন্ডল স্থাপন করেছিলেন।

(২) শিবাজী মহারাজ নৌবাহিনী স্থাপন করেছিলেন।

৪. তক্তা পুর্ন করো।

(সামরিক) সৈন্য ব্যবস্থা
- ------
  - *হাবালদার*
  - ------
- অশ্বারোহী
  - ------
  - ------

উপক্রম

(১) তোমাদের পরিসরে থাকা ভারতীয় সৈন্যদলে কাজ করা ব্যক্তির সাক্ষাৎকার করো।

(২) তোমাদের গ্রামের বাজারের পরিদর্শন করে পরিসরে তৈরি হওয়া বস্তু (জিনিস) এবং বাহিরের গ্রাম থেকে বিক্রীর জন্য আনা জিনিসের (বস্তুর) একটি তালিকা তৈরি করো।

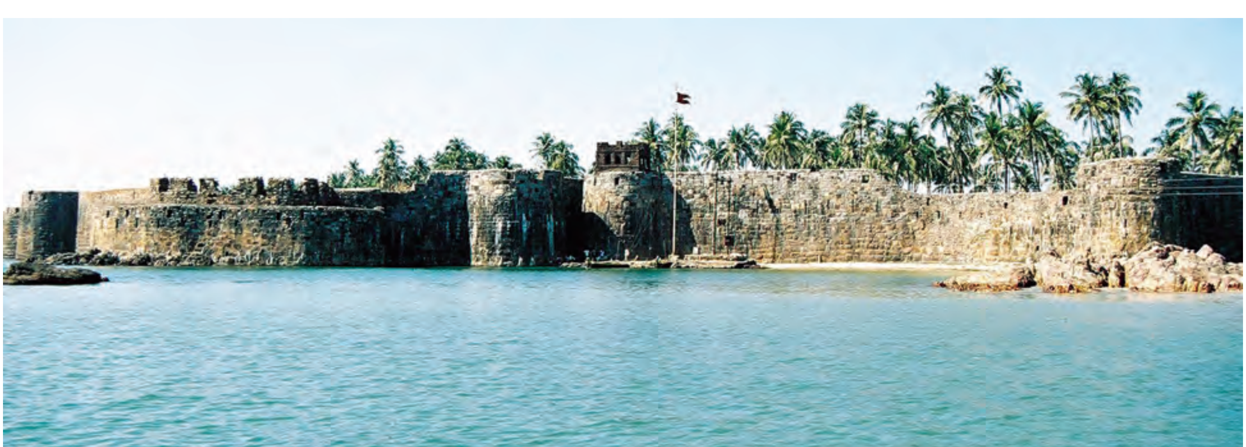

সিন্ধুদুর্গ কিল্লা

৪. আদর্শ শাসক

স্বরাজ্যস্থাপনার পূর্বে মহারাষ্ট্রে আদিলশাহী, সিদ্দী, পুর্তুগীজ। মুঘল এই সত্তার প্রাধান্য ছিলো। এই সত্তার বিরুদ্ধে শিবাজী মহারাজ সংগ্রাম করেছেন তিনি সব ধরনের প্রতিকুল পরিস্তিতির সামনে গেলো। তিনি স্বতন্ত্র এবং সার্বভৌম এমন স্বরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই স্বরাজ্যের প্রশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন স্বরাজ্যের সুরাজ্য করলেন। মহারাজ নিজের কর্তব্য পরায়নের নতুন সৃষ্টির নির্মাণ করলেন। স্বরাজ্যস্থাপনার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে মহারাজ নিজে অনেক বড় বিপদের সম্মুখীন হলেন। আফজাল খানের মিলন প্রসঙ্গ, পানহালার অবরোধ শায়িস্তাখানের উপর ছাপা, আগ্রা থেকে পালিয়ে আসা এই সব প্রসঙ্গ বড় আঘাতের ছিলো। তিনি এই ধরনের প্রসঙ্গ সফল কাটিয়ে উঠেছে। সেখান থেকে তিনি নিরাপদে বেরিয়ে আসে।

একটু বিচার করো ।

জীবনদানকারী সহকর্মী থকার কারণে শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্য স্থাপন করতে পেরেছে।

বিভিন্ন ভাষায় হিতোপদেশ বন্ধুত্বের গুরুত্বের উপর জোর দেয় তাহা খোঁজো, উদা - A friend in need is a friend indeed.

সংগঠন চাতুর্য: স্বরাজ্যের কাজের জন্য মহারাজ নিজের চারিপাশের লোকদেরকে প্রেরিত করেছিলেন। তাঁরকাছে বিলক্ষন সংগঠন চাতুর্য ছিলো। সেই চাতুর্যের জোরে নিজের চারিপাশের সাহসী ও জীবনদানকারী লোক একত্রিত করেন। স্বরাজ্যের কাজে তার এই সহকর্মীরা নিজের প্রানের বিচার না করে নিজের দায়িত্ব পালন করলো। আফজাল খানের সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গ চরমভাবে বিপদের সময় জিবা মহালা বড় সৈয়দকে মেরেছিলো। পানহালগড়ের দুর্গের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় শিবাজী মহারাজের ভূমিকায় আচরন করা শিবা কাশিদ, মহারাজ বিশাল দুর্গের দিকে যাওয়ার সময় তার অনুসরনকারী শত্রুদের রাস্তা ধরে রাখা বাজীপ্রভু দেশপান্ডে, সিংহগড় জিতবার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া তানাজী মালুসরে, মহারাজার আগ্রা থেকে পালিয়ে আসার সময় বড় দক্ষতা নেওয়া হিরোজী ফর্জন্দ এবং মাদারী মেহেতর এমন অনেক উদাহরণ স্বরাজ্য স্থপনার কাজে দেখা যায়। মহারাজ তাঁর সহকর্মীদের দেখাশোনা করত। উদাহরনে, স্বরাজ্য স্থাপনার কাজে কান্ডোজী জেধে শুরুথেকে মহারাজের সাথে ছিলো। বয়স বৃদ্ধির কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসায় কোনো প্রকারের কম না হয় এমনটা বললে।

রয়তের চিন্তা : *স্বরাজ্য* স্থাপনার কাজে মহারাজার শত্রুর সাথে সংঘর্ষ (লড়াই) শুরু ছিলো। শত্রুর আক্রমনে প্রজা কষ্ট পাবে। এমন সময় *রয়তের* বেশি দেখাশোনা করা মহারাজের চেষ্টা ছিলো। শায়িস্তাখানের আক্রমনের সময় মহারাজ রোহিডখোড়ের দেশমুখকে রয়তের ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সতর্ক করলো। তিনি সেই দেশমুখকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘাটের নিচে যেখানে সুরক্ষিত জায়গায় লোকেদের নিয়ে যেতে বললো। এই কাজে এক মুহূর্ত দেরি না করা এভাবেই শোনালো। পরে মহারাজ তার নিম্ন নির্দেশ দিলো, যদি রয়তের দেখাশোনা না নেওয়া হয় তাহলে মুঘল সৈন্য আসবে, লোকেদের বন্ধী করবে এবং তার পাপ তোমাদের মাথায় বসবেই নিজের সৈন্যদের নিকট হইতে *রয়তের* কষ্ট না হয় মহারাজ এমন যত্ন নিতেন।

সাময়িক নীতি: মহারাজার সামরিক নীতি নিয়ম শক্ত ছিল। সৈন্যদের সময় মত বেতন দেওয়া, এব্যাপারে তিনি কটাক্ষ্যপাত ছিলো, তিনি সৈন্যদের বেতন নগদ টাকায় দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মধ্যযুগে

ভারতে বিভিন্ন জায়গায় রাজবন্টী (জায়গায়) এবং অন্যএ সৈন্যদের নগদ বেতনের পরিবর্তে জাহাগীর দেওয়ার পদ্ধতি ছিলো। মহারাজ এই পদ্ধতি বাতিল করলো। তার মহিমা যখন শত্রু অঞ্চল যায়। তাই সৈনিক যা পায় সে সব সরকার জমা করার সমন্ধে সৈন্যদের সতর্কতা ছিলো। মহিমায় তার দক্ষতার জন্য তাকে সম্মানিত করা হয়। যুদ্ধে যে সৈনিক মৃত্যুবরন করে তার পরিবারের জীবিকার যত্ন নেওয়া হয়। ক্ষত-বিক্ষত সৈন্যদের যত্ন নেওয়া হয়। যুদ্ধে শরনে আসা কিংবা বন্দী হওয়া সৈনিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।

তুমি জানো কি?

আবাদের মৌসুমে যুদ্ধ বাঁধলে কৃষকদের দুর্দশা লাঘব হবে। বপনের কাজে সৈন্যদের চলাচল বাধা সৃষ্টি করে, কখন কখন খাড়া ফসল কেটে নিয়ে যায় অথবা নষ্ট করে। কৃষকদের বাড়িঘর লুট করেন নিজেদের সৈনিকদের এমন কর্ম থেকে দূরে থাকতে মহারাজ তার অধিকারীর আদেশ দিলো। এই উপলক্ষে ই.স-১৬৭৪ সালে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ নিজের সৈন্য অধিকারীর উদ্দেশ্যে লেখা পত্র খুব মূল্যবান। এ থেকে ধারনা পাওয়া যায় মহারাজা সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা সম্পর্কে কতটা সতর্কতার সাথে চিন্তা করেছিলো।

বিলাতীস তসবীস দিতে লাগলো, ‘‘এশাস লোকজাতি, কেউ শষ্যের দানা আনবে, কেউ রুটি, কেউ ঘাস, কেউ কাঠ, কেউ সব্জী, কেউ শাকসব্জী, এরকম করা মানে যারা বাড়িতে থেকে কোনোরকম ভাবে জীবিকা নির্বাহ করছিল, তারা ঘর ছেড়ে যেতে লাগল। অনেক অনাহারে মরতে লাগবে। অর্থাৎ এইরুপ হবে, মূগল শাসনকালে যে উৎপিড়ন শয্য করতে হয়েছিল তার থেকে বেশী উদ্বিগ্ন হতে হবে।

সহনশীল আচরণ : মহারাজের যে সত্তার সাথে সংগ্রাম করা লাগলো। তার মধ্যে আদিলশাহ, মুঘল এবং সিদ্দী এই সত্তা ইসলামী ছিলো। কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মহারাজ স্বরাজ্যের মুসলমানদের নিজের প্রজা বলে মনে করেন। আফজাল খানের দেখা করার সময় মহারাজার সৈন্যদলে সিদ্দী ইব্রাহিম এই বিশ্বাসনীয় সেবক ছিলো। সিদ্দী হিলাল মহারাজার সৈন্যদলে সরদার ছিলো। স্বরাজ্যের নৌবাহিনীতে দৌলতখান গুরুত্বপূর্ণ অধিকারী ছিলো।

মহারাজার ধার্মিকনীতি সহনশীল ছিলো। শত্রুপক্ষের একটি অঞ্চল জিতে নেওয়ার পরে, সেখানকার মুসলিম ধর্মস্থানকে প্রথম থেকে প্রাপ্ত সুবিধা শুরু রেখেছিলেন। তার সহনশীল ধার্মিক নীতি নিয়ম সমন্ধে সমসাময়িক ইতিহাসকার খাফিখান লিখেছে - ‘শিবাজী নিজের সৈন্যদের জন্য কঠোর নিয়ম করেছিলেন। প্রচারনায় থাকতে মসজিদে ধাক্কা দেবে না। কুরানের একটি প্রত হাতে পড়লে তাকে পূজ্যভাব দেখিয়ে একজন মুসলমান ব্যক্তির স্বাধীন করবো।’

স্বাধীনতার প্রেরনা: শিবাজী মহারাজার স্বরাজ্য স্থাপনার প্রযত্ন একটি আলাদা মূল্য আছে। সে মূল্য স্বতন্ত্রের অন্য কোন সত্তার আধিপত্য না, মেনে নিজের স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম অস্তিত্ব রাখা। এর পেছনে এই উদ্দেশ্য। বিদেশী এবং অন্যায়কারী সত্তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে মহারাজ অন্যদের প্রেরনা দিলেন। মুঘলদের সেবায় থাকা ছত্রসাল যখন মহারাজ পেলো। তখন মহারাজ সেই বুন্দেলখন্ডকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নির্মাণ করার প্রেরনা দিয়েছেন।

মহারাজের কাজের মাহাত্ম্য : মহারাজা অনেক শত্রুর সাথে লড়াই করতে করতে স্বরাজ্যের স্থাপনা করলো, এই কৃতি মহারাজকে যুগপ্রবর্তকত্ব প্রমানিত করে। কিন্তু এই কৃতি ব্যতিরিক্ত তার ব্যক্তিমত্বে অনেক সদগুন দেখা যায়।

মহারাজ খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি অনেক বিদ্যা আত্মসাত করেছিলেন। তিনি অনেক ভাষা এবং লিপি জানতেন। মা-বাবার করা স্বরাজ্য স্থপনার এবং নৈতিক সংস্কার তার মনের গভীরে প্রোথিত ছিলো। তার ব্যক্তি মহত্বে চরিত্র এবং সক্ষম (সামর্থ্য) বিনয় এবং পরাক্রম এর সমন্বয় হয়েছিলো। তারকাছে নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপন, দৃষ্টিপন, রাজনৈতিক কূটনীতি, বেসামরিক এবং সৈন্য প্রশাসন বিষয়ে প্রভাবী নীতি সত্য এবং ন্যায় এর উপরে নিষ্টা, সবার সাথে সমান আঁচারণের বৃত্তি। ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে রাখার প্রয়োজন। পরিকল্পিত প্রকল্পের সমাধান করার দক্ষতা। সংকটে আছন্ন না হয়ে সিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। সদা জাগ্রত থাকার সতর্কতা ইত্যাদি অসংখ্য গুন ছিলো।

নারীদের সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। প্রজাদের মধ্যে কৃষক, কারিগর, সৈনিক, ব্যাপারী এরকম সব ধরনের ঘটকের তিনি লক্ষ্য দিতেন। স্বধর্মের ব্যক্তির মতো অন্যধর্মের ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য ছাড়াই সম্মান করতেন। পরধর্মে যাওয়া ব্যক্তির স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা সে সময় বিরোধ ছিলো। সেই সময় এমন ব্যক্তিদের স্বধর্মে ফিরিয়ে নিলেন। মাঝে মাঝেই তাদের সাথে সম্পর্ক করলেন। ধর্মীয় কারনে সমুদ্র পর্যটন বিরোধ ছিলো। সেই সময়ে তিনি সিন্ধু দুর্গের মতো জলদুর্গ নির্মিতী করলেন এবং নৌবাহিনীর নির্মিতী করলেন। তিনি সাগর থেকে হওয়া আক্রমণের আন্দাজ নিয়ে তার উপায় তিনি করে রেখেছিলেন। এর মানে এটাই। তিনি রাজ্যভিষেকের মাধ্যমে স্বরাজ্যের অধিকৃত রাজা হলো। তিনি এক রাজ্যভিষেকের পরে ধার্মীক দৃষ্টিতে আলাদা ধরনের দ্বিতীয় রাজ্যভিষেক করে নেন। তার এই সব কৃতি তার ধার্মিক ক্ষেত্রে ক্রান্তিকারকত্ব দেখানোর ছিলো।

স্বরাজ্যের উপর যখন প্রানঘাতী সংকট আসে সহকর্মী ছাড়া অথবা নিজেই তাদের সাথে সংকটের সাথে লড়াই করে। যার কারণে তার সহকর্মীরা স্বরাজ্যের জন্য প্রান বিসার্জন দিতে প্রমানিত থাকতো। কেবল এমন বড় সংকটে ধৈর্য্য ধরে এবং নির্ভয়ে আগে যাওয়া। এটাই তাদের মহানুভবতা না। তাদের নিজেদের স্বরাজ্যের নৈতিকতা এবং মানের আধার দেওয়ার ছিলো। এজন্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রমানে ছোট ছোট জিনিসের ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্টদের উচিৎ নির্দেশ দিতে দেখা গেছে। সৈনিকরা কৃষকদের ক্ষেতের সবজী জোর করে নেওয়া চলবে না। এই অর্থের ক্রম সে ক্ষেত্রে আদর্শ। তিনি গাছ কাটা, লাগানো বন্ধন মহত্বপূর্ণ ছিলো।

চিন্তন করো।

বৃক্ষসংবর্ধন করা প্রয়োজন কেন?

দুর্গের উপরে আবর্জনা এখানে-ওখানে না ফেলে সেগুলি জ্বালিয়ে এবং তার ছাইয়ের উপরে সব্জি লাগাবে। এমনটা মহারাজের আদেশ ছিলো। তিনি স্বরাজ্যের স্থাপনা করতে ছোট ছোট বিষয়টির দিকে কত লক্ষ্য দিতেন। এটা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার তিনি কেবল যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি এক নতুন স্বতন্ত্র নীতিমান এবং সুসংস্কার সমাজ নির্মাণ করা শিল্পকার ছিলেন। তাঁর মাহাত্ম্য সর্বব্যাপী।

বলো দেখি।

- কিভাবে আপনার এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়?
- বর্জ্য ব্যবস্থাপন করা যন্ত্রের নাম বলো।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনে মহারাজ ছিলেন এক মহান অনুপ্রেরনা। মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে তিনি সাম্যের সংগ্রামে পোবাডার মাধ্যমে মহারাজের গুরুত্ব বলেছেন।

তুমি জানো কি?

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজার উপরে ১৮৬৯ সালে একটি পোবাডা তৈরি করেন। তার কিছু ভাগ এখানে দেওয়া হলো।

।। শিবার প্রয়োজনে জয়নামের পতাকা তোলা হয়।।
ক্ষেত্রের মেলা মাওলা শিকার খেলায় মায়ের পায়ের
আমানত জোয়রি লাঠির অভিমান নাই।
আশির্বাদ নেই মায়ের।
আলাবালা নেই পছন্দ ছিল জিজাবাই।
পোবাডা গাই শিবাজীর।
কুলওয়াদি-ভূষন পোবাডা গেয়েছেন। ভোসলেদের।
ছত্রপতি শিবাজীর ।।৩।।

লোকমান্য তিলক শিবজয়ন্তী উৎসবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জাগৃতি করলো। শিবচরিত্রের তথ্য দেওয়া পুস্তক লালা লাজপত রায় ইনি লিখেছেন। তামিল কাব্যের পিতামহ সুব্রামনিয়াম ভারতী ইনি শিবাজী মহারাজ নিজের সহকর্মীদের উদ্দেশে বলছে। এমন প্রসঙ্গ কল্পনা করে কাব্যরচনা করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইনি মহারাজার উপরে এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। মহারাজার রাজ্যসাধনের প্রচেষ্টার দিকে মহান হেতুঁসাধনের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেন। । স্যার জদুনাথ সরকার ইনি- 'শিবাজী এন্ড হিজ টাইমস' এই গ্রন্থে শিবাজী মহারাজার কাজের গৌরব করেছেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ইনি মহারাজের বিষয়ে বলেছেন যে মহারাজ কেবল মহারাষ্ট্রের নয়, তবে তিনি রাষ্ট্রের ছিলো। তার নিজের দেশের উপরে খুব প্রেম ছিলো এবং মানুষের সদগুনের তিনি সাক্ষাৎ প্রতিক ছিলো। ভারতের সব ভাষায় মহারাজার প্রেরণা এবং আদর্শ বলার সাহিত্য নির্মাণ করা হয়েছে।

শিবাজী মহারাজার এই স্বরাজ্য কার্যের এবং তার সুসজ্যায় রূপন্তর করার প্রেরনা নতুন প্রজন্মের আদর্শ থাকবে। শিবাজী মহারাজ একজন মহান রাষ্ট্রপুরুষ ছিলেন।

অনুশিলনী

১. পাঠে খোঁজো এবং লেখো।

(১) শিবাজী মহারাজের জীবনে আঘাতের ঘটনা কোনটি ছিলো।

(২) শিবাজী মহারাজ আগ্রা থেকে পালানোর সময় ঝুঁকি নিয়েছিলো কে?

(৩) রোহিডখোরের দেশমুখের শিবাজী মহারাজের কি সতর্কতা দিয়েছিলো?

(৪) শিবাজী মহারাজের কোন প্রেরনা নতুন প্রজন্মের আদর্শ থাকবে?

২. লেখন করো।

(১) *রয়তের* (অঞ্চলের) ক্ষতি না হয় তারজন্য শিবরায় সৈনিকদের কি সতর্কতা বার্তা দিয়েছিলো?

(২) শিবাজী মহারাজের ধার্মিক নীতি সহনশীল ছিলো, এটা কোন বিষয়ে দেখা যায়?

(৩) শিবাজী মহারাজার সৈনবিষয়ক নীতি স্পষ্ট করো।

৩. একবাক্যে উত্তর লেখো।

(১) স্বরাজ্যের নৌবাহিনী গুরুত্বপর্ণ অধিকারী -

(২) শিবাজী মহারাজার কাব্য রচনার তামিল কবি -

(৩) বুন্দেলখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য নির্মাণ কারক -

(৪) পোবাডা দ্বারা শিবাজী মহারাজের তথ্য বলা -

উপক্রম

(১) অসুবিধার সময় বন্ধুর সাহায্যে শ্রেণীকক্ষে কথন (আলোচনা) করো।

(২) ব্যক্তির নামে থাকা গ্রাম, শহরের তালিকা তৈরি করো।

৯. মরাঠাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মৃত্যুর পরে মরাঠী ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজ, ছত্রপতি রাজারাম মহারাজ এবং তারাবাই এর নেতৃত্বে স্বরাজ্য সংরক্ষনের জন্য মুঘলের সাথে প্রখর লড়াই করিয়েছেন। এই সাতাশ বর্ষের দীর্ঘ লড়াইকে মরাঠাদের স্বতন্ত্র সংগ্রাম বলে। ই.স. ১৬৮২তে স্বয়ং ঔরঙ্গজেব বাদশাহ দক্ষিণে চলে এলো। এখন মুঘলের সাথে সংগ্রামে অনেক অসুবিধা ব্যতিক্রম করে মারাঠা জয়ী হয়। এই স্বতন্ত্র সংগ্রাম মানে ভারতের ইতিহাসে এক রোমাঞ্চ ও অত্যাশ্চর্য কালখন্ড ছিলো। আমরা এই পাঠে স্বতন্ত্র সংগ্রামের বিষয়ে পড়া শোনা করতে যাচ্ছি।

এখানে ‘মারাঠা’ এই শব্দ ‘মরাঠী ভাষা বলা’ বা মহারাষ্ট্রীয় লোক এর অর্থ।

করে দেখো।

আমি সম্ভাজী বলছি---ভূমিকা অভিনয় করো।

ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজ

ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজ : সম্ভাজী মহারাজ ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জেষ্ঠ পুত্র ছিলো। তার জন্ম ১৪ মে ১৬৫৭ সালে পুরন্দের দুর্গে হয়েছিলো। শিবাজী মহারাজার পরে তিনি ছত্রপতি হলেন। সে সময় মারাঠাদের মুঘলদের সাথে লড়াই শুরু ছিলো। এমন স্থিতিতে ঔরঙ্গজেবের ছেলে শাহজাদা আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। এই বিদ্রোহ বাদশাহ ভঙ্গ করলো। পরে আকবর দক্ষিণে সম্ভাজী মহারাজের আশ্রয়ে এলো। তার দমন করার জন্য বাদশাহ নিজে ই.স-১৬৮২ সালে দক্ষিণে এলো। তার সাথে প্রচুর সৈন্য এবং প্রভাবী তোফখানা ছিলো। তিনি জিজ্ঞিয়ার সিদ্দীকে মারাঠার বিরুদ্ধে প্রচারনা হাতে নিতে বললো। পর্তুগীজ নিজেরা আলাদা করে নিলো। এইকারণে সম্ভাজী মহারাজের একসময়ে অনেক শত্রুর মুকাবলা করার প্রসঙ্গ এলো।

সম্ভাজী মহারাজার কাজ এটা শিবাজী মহারাজার পরে মারাঠাদের স্বতন্ত্র সংগ্রামের প্রথম পর্ব। মহারাজ নিজের কার্যকালে বেসামরিক রাজশাসনের ও সৈন্য প্রচারনার উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলেন। বয়সের চৌদ্দ বৎসরে সে রাজ্যের প্রশাসন ও সৈন্যের অধিপত্যের দিকে লক্ষ্য দিতে লাগলেন। যুবরাজ থাকতে তিনি মুঘলও আদিলশাহের অনেক অঞ্চলে আক্রমন করেছিলেন। তাঁর যুদ্ধ কৌশল বর্ণনা করতে সেই সময়ে ফ্রান্স প্রবাসী অঁবে করে বলে-এই যুবরাজ ছোট থাকলেও ধৈর্য্যশীল এবং নিজের বাবার মতো কৃতি ও শুরবীর ছিলো।

সম্ভাজী মহারাজ ছত্রপতি হওয়ার পরে মরাঠার মুঘলদের লড়াই অধিক তীব্র হলো। কাবুল থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত মুঘলদের একছত্রী শাসন নির্মান করার ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য ছিলো। নিজের প্রচন্ড সৈন্য ও আর্থিক শক্তির জোরে মারাঠাদের রাজ্য পরিষ্কার ডুবিয়ে ফেলবো। এমনটা তার স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু সম্ভাজী মহারাজ নিজের পরাক্রম ও যুদ্ধ কৌশালে তার এই স্বপ্ন ধুলোয় মিলিয়ে দিলো। তার সৈন্যের টুকরো অনেক মুঘল অঞ্চলে আক্রমন করতে ছিলো। মরাঠাদের নাশিকের নিকটের রাম সেজের দুর্গ বাদশাহের সৈন্য দীর্ঘকাল চেষ্টা

করেও নিতে পারেনি। এইভাবে সম্ভাজী মহারাজার পরাক্রমে ঔরঙ্গজেব জেরিস হয়েছিলো। যার কারণে একদিন অত্যান্ত রাগে তিনি নিজের মাথার পাগড়ি মাটিতে আছাড় মারলো এবং প্রতিজ্ঞা (সংকল্প) করলো। সম্ভাজী মহারাজাকে না পরাজিত করা পর্যন্ত আমি এই পাগড়ি পরবো না। সম্ভাজী মহারাজ ঔরঙ্গজেবকে আতঙ্কিত করেছিলেন।

তুমি জানো কি?

মরাঠা দুর্গ জিতলে তার রাজ্য শেষ এই বিচারে শুরুতে ঔরঙ্গজেব নাশিকের নিকট রামসেজ দুর্গে ঘেরাও করলো। ঔরঙ্গজেবের সৈন্য সংখ্যা অনেক ছিলো। মরাঠাদের সৈন্য সংখ্যা কম ছিলো। কিন্তু তাহারা ভিষণভাবে প্রতিরোধ করলো। এই ঘেরাও আগে পাঁচ বৎসর চললো। অল্প মারাঠা সৈনিকের করা পরাক্রম অদ্বিতীয় ছিলো। মারাঠীদের প্রতিরোধের কারণে মারাঠাদের সাথে লড়াই করা কঠিন। এর জ্ঞান ঔরঙ্গজেবের হয়ে গিয়েছিলেন।

সিদ্দী বিরুদ্ধে মোহিম: জিঞ্জিয়ার সিদ্দী মরাঠী অঞ্চলে উপদ্রব করতে ছিলো। মারাঠী অঞ্চলে অগ্নিসংযোগ, লুটমার ও অত্যাচার করতেছিলো। ঘরে যেমন ঈন্দুর, তেমনি রাজ্যে সিদ্দী এমন তার বর্ণনা সদস্যরা করেছে। সম্ভাজী মহারাজ ই.স১৬৮২ সালে তার বিরুদ্ধে মোহিম খুললো। তার সৈন্য তার অধিকারের দন্ডরাজপুরী এই দুর্গের ঘেরাও করলো এবং জিঞ্জিয়ার উপরে তোফের বর্ষন করলো। কিন্তু সেই সময় মুঘল সেনা স্বরাজ্যে চলে আসলো। যার কারনে জিঞ্জিয়ার মোহিম (প্রচারনা) আংশিক ছেড়ে সম্ভাজী মহারাজর পিছে ফিরে এলো।

পুর্তগীজের বিরুদ্ধে প্রচারনা (মোহিম): গোওয়ার পুর্তগীজ সম্ভাজী মহারাজার বিরুদ্ধে বাদশাহের সাথে হাত মিলিয়ে ছিলো। এইজন্য তিনি পুর্তগীজের পাঠ শেখানোর নির্ধারণ করলো। তিনি ই.স-১৬৮৩ সালে পুর্তগীজের রেবদণ্ডা বন্দরে আক্রমন করলো। প্রতিউত্তরে পুর্তগীজরা গোওয়াক সীমায় মারাঠাদের ফোন্ডা দুর্গ ঘেরাও করলো। মারাঠা ঘেরা ভেঙ্গে ফেঁললো এবং গোওয়ার উপরে আক্রমণ করলো। এই লড়াইয়ে য়েসাজী কংক পরাক্রমের বাজি রাখলো। এতে পুর্তগীজ গর্ভারনার জখমী হলো। তাদের পিছতে হলো সম্ভাজী মহারাজ তাদের পিছু করলো। পুর্তগীজ প্রচন্ড বিপদে পড়লো। সেই সময় মুঘলরা দক্ষিণ কোকনের উপরে আক্রমন করার খবর সম্ভাজী মহারাজ পেলো। যেকারণে হাতে আসা গোওয়া বিজয় ছেড়ে ওনার মুঘলের প্রতিকার করতে ফিরে যেতে হলো।

আদিলশাহী ও কুতুবশাহীর অন্ত: ঔরঙ্গজেবের মারাঠার বিরুদ্ধে মহিমায় (প্রচারণায়) সফল হচ্ছিল না। যার কারণে তিনি ঐ মোহিম ছেড়ে দিলো। তারপরে তিনি নিজের আন্দোলন আদিলশাহী ও কুতুবশাহীর রাজ্যের দিকে বাড়ালো। ঔরঙ্গজেব সে রাজ্য জিতে নিলো।

এই দুই রাজ্যের সম্পত্তি ও সৈন্য মুঘলের হাতে আসায় ঔরঙ্গজেবের স্থিতি শক্তিশালী হলো। তারপরে মারাঠাদের উপর ঘেরাও করার জন্য নিজের সর্বশক্তি কেন্দ্রিত করলো। তার অঞ্চলের চারিপাশ দিয়ে আক্রমন করলো। মুঘল সেনাক প্রতিকার করতে গিয়ে মারাঠা সেনাপতি হম্বিররাও মোহিতে মৃত্যু বরন করলো যার কারণে সম্ভাজী মহারাজের সৈন্য শক্তি কমজোর হয়ে গেলো।

সম্ভাজী মহারাজের অসামরিক বিষয়ক: (প্রশাসন) সম্ভাজী মহারাজ যুদ্ধের এই ধুনে নিজের অসামরিক রাজ্য প্রশাসনের দিকে দুর্লক্ষ্য করেনি। তিনি শিবাজী মহারাজার সময়ে সঠিক ন্যায়বিচার এবং রাজস্ব ব্যবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। যারা স্বরাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং যারা সাধারণ প্রজাদের কষ্ঠ দিয়েছিল তাদের তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন মহারানী

(সম্রাজ্ঞী) ইয়েসুবাইকে শাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাহার নিজের সিকি (মুদ্রা) তৈরী করে দিয়েছিল। তিনি কর্মজীবনে জনগনের সুবিধার জন্য শিবরায়ের নীতি এগিয়ে নিয়ে যান।

সম্ভাজী মহারাজ সংস্কৃত সহ অনেক ভাষা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি গ্রন্থপঞ্জিও করেছেন। রাজনীতির উপর প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের অবলোকন করে তাহার সংক্ষিপ্তসার 'বুধভূষণ' এই গ্রন্থে করেছিলেন ।

তুমি জানো কি?

সম্ভাজী মহারাজ সংস্কৃত ভাষায় 'বুধভূষণ' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। ইহাতে রাজার লক্ষণ, প্রধান, রাজ পুত্র, তার শিক্ষা ও কাজ, রাজার উপদেষ্টা, দুর্গ ও দুর্গের সাহিত্য, সেনাবাহিনী, রাজার কর্তব্য, গুপ্তচর প্রণালী ইত্যাদির সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

সম্ভাজী মহারাজের মৃত্যু : ঔরঙ্গজেব সম্ভাজী মহারাজকে বন্দী করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল। তিনি মোকাররাবখান ইহার নিযুক্ত কোল্হাপুর প্রদেশে করেন। মুকররাবখান খবর পেল যে মহারাজ কোকনের সঙ্গমেশ্বরে আছেন। এরপর সে ছাপামার অভিযান চালিয়ে সম্ভাজী মহারাজকে ধরে ফেলেন। যখন তাকে সম্রাটের সামনে আনা হয়েছিল, তখন তিনি তার সামনে খুব তীক্ষ্ণভাবে আচরন করেছিলেন। তারপর ১১মার্চ ১৬৮৯ সম্রাটের আদেশে তাকে অমানবিক ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। মারাঠাদের এই ছত্রপতি তার আত্মসম্মান ত্যাগ করেননি এবং অত্যন্ত ধৈর্য ধরে মৃত্যুর মুখোমুখি হন। তাঁর আত্মত্যাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মারাঠারা তাদের মুঘল-বিরোধী সংগ্রামকে আরো তীব্র করে তোলে।

ছত্রপতী
রাজারাম মহারাজ

ছত্রপতী রাজারাম মহারাজ: রাজারাম মহারাজ ইনি ছত্রপতী শিবাজী মহারাজের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তার জন্ম ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে রায়গড়ে হয়েছিল। সম্ভাজী মহারাজের মৃত্যুর পর তিনি ছত্রপতি হন। এখন মারাঠা রাজ্য জয় করার তার স্বপ্ন সত্যি হবে, এমন ঔরঙ্গজেব ভারতে শুরু করলো। তাই সে রায়গড়কে অধিকার করার জন্য ঝুল্ফি কারখানকে পাঠায়। তখন রাজারাম মহারাজ ও তাঁর স্ত্রী মহারানী তারাবাই এবং সম্ভাজী মহারাজের স্ত্রী ইয়েসুবাই ও পুত্র শাহু রায়গড়ে ছিলেন। তাদের সবার একই জায়গায় থাকা বিপজ্জনক ছিল। এই প্রসঙ্গে ইয়েসুবই সাহসের সঙ্গে এই অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি হন। কোনো অবস্থাতেই মোগলদের কাছে আত্মসমর্পন না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি রায়গড়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন। তদনুসার, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে রাজারাম মহারাজ রায়গড়ের অবরোধ থেকে বেরিয়ে যাবে এবং প্রয়োজন পড়লে জিঞ্জি পর্যন্ত যাবে। এটাও সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে মহারানী ইয়েসুবাইয়ের নেতৃত্বে রায়গড়ে যুদ্ধ করা হবে। ইয়েসুবাই তার পুত্রকে ছত্রপতি নিযুক্ত না করে রাজারাম মহারাজকে ছত্রপতি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর সিদ্ধান্ত স্বরাজ্যের প্রতি ভালবাসা এবং চরম স্বার্থত্যাগের উদাহরণ। তিনি নিজে ও নিজের সন্তানের প্রাণের চিন্তা না করে মারাঠাদের ছত্রপতিকে সুরক্ষিত রেখেছেন।

চলো, খুঁজে দেখি

ভারতের মানচিত্রে জিঞ্জি এই স্থান খোঁজ করো।

জিঞ্জিতে রাজারাম মহারাজের যাত্রা : ৫ এপ্রিল ১৬৮৯ সালে রাজারাম মহারাজ তাঁর কিছু সহযোগী সহ রায়গড়ের অবরোধ থেকে পালিয়ে যান। তিনি দক্ষিণে জিঞ্জিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। জিঞ্জির দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য। এই দুর্গ জয় করা মুঘলদের জন্য সহজ ছিল না। প্রলাদ নিরাজী, খন্ডো বল্লাল, রুপাজী ভোসলে ইত্যাদি বিশ্বাসী লোকের নিয়ে রাজারাম মহারাজ জিঞ্জিতে পৌঁছেছিলেন।

মরাঠাদের আন্দোলন: মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে রায়গড় দীর্ঘদিন লড়াই করা কঠিন ছিল। মুঘলরা ১৬৮৯ সালের নভেম্বর মাসে রায়গড় দখল করে এবং মহারানী ইয়েসুবাই এবং শাহুকে বন্দী করে। জিঞ্জিতে যাওয়ার পথে রাজারাম মহারাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্ব রামচন্দ্রপান্ত অমাত্য, শংকরাজি নারায়ন সম্পাদক, সান্তাজী ঘোরপড়ে এবং ধনাজী মাধবের উপর দিয়েছিলেন।

মারাঠাদের দৃষ্টিকোনে এটা একটি সিদ্ধমূলকস্থিতির জন্য পরিস্মিতী জরুরী ছিল। ঔরঙ্গজেব মারাঠী প্রধানদের জমি-জায়দাত দিয়ে তাদের পক্ষে করে নিয়েছিল। রাজারাম মহারাজ ঔরঙ্গজেবের প্রতিউত্তরে এই কৌশল ব্যবহার করেন। মুঘল ভূখণ্ডের বিজয়ীকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে সেই অঞ্চলের জাহাগিরি সেই অঞ্চল জয়কারী প্রধানদের দেওয়া হবে। ছত্রপতির এই আশ্বাসের পর অনেক পরাক্রমী প্রধানরা এগিয়ে এসেছিলেন। তারা মুঘল অঞ্চলে ভয়ঙ্কর আক্রমন শুরু করে এবং মুঘল যোদ্ধাদের পরাজিত করে। এই পরাক্রমে সর্বাগ্রে ছিলেন সান্তাজি এবং ধনাজি। তাদের অনির্দেশ্য আক্রমণ এবং গুরিল্লা যুদ্ধ কৌশলের কারন মুঘলদের জন্য তাদের বিশাল সরঞ্জাম এবং ভারী কামান ব্যবহার করা কঠিন হয়ে গিয়েছিল প্রযাপ্ত দুর্গ, অঞ্চল এবং ধন-সম্পত্তী না থাকাতেও মারাঠারা মুঘলদের এমন হাল করে যে তাদের পালায়ন করার জন্য রাস্তা বা পথ পর্যন্ত ছিল না। একবার সান্তাজি ঘোরপড়ে এবং বিঠোজি চব্হান হঠাৎ সম্রাটের সেনানিবাসে আক্রমন করে এবং তার তাঁবুর উপর থেকে সোনার মুকুট কেটে আনে।

তুমি জানো কি ?

মুঘল সৈনিক ধনাজিকে এতটাই ভীত ছিল যে ঘোড়া জল পানকরা বন্ধ করলে তাকে জিজ্ঞসা করত, 'কি রে, তুই কি জলে ধনাজিকে দেখছিছ?

জিঞ্জির ঘেরা: রায়গড় দখলের পর সম্রাট জিঞ্জি আক্রমণের জন্য ঝুলফিকারখানকে দক্ষিণে পাঠায়। সে জিঞ্জিকে ঘিরে ফেলে। মারাঠারা প্রায় আট বছর পরাক্রমের সহিত জিঞ্জির দুর্গে যুদ্ধ করেছিল। সান্তাজি এবং ধনাজি বাইরে থেকে ঘেরা লাগানো মুসল সেনাবাহিনীর উপর প্রচন্ড আক্রমন করে। অবশেষে রাজারাম মহারাজ অবরোধ (ঘেরা) থেকে বেরিয়ে এসে মহারাষ্ট্রে ফিরে আসেন। এরপর ঝুলফিকারখান জিঞ্জি দুর্গ জয় করে।

রাজারাম মহারাজ ফিরে আসার সাথে-সাথে মারাঠাদের বীরতায় বৃদ্ধি হয়। তিনি খান্দেশ, বাহাদ এবং বাগলানের মুঘল-অধিকৃত এলাকা আক্রমন করেন। রাজারাম মহারাজ তার বিচক্ষণ মনোভাব এবং কূটনীতি দিয়ে সান্তাজি এবং ধনাজির মতো শত-শত মারাঠা বীর তৈরী করেছিলেন। তাদের স্বরাজ্য রক্ষার প্রেরনা তৈরী করার জন্য মূল্যবান কার্য করেন কিন্তু এই সব চলছিল ইতিমধ্যে ২ মার্চ ১৭০০ সালে রাজারাম মহারাজ সিংহগড়ে সামান্য একটু রোগে মারা যান।

রাজারাম মহারাজ ছিলেন বিচারশীল এবং মিলনসার। তিনি মারাঠী রাজ্যের সমস্ত পরাক্রমী বীরদের একত্রিত করেছিলেন। তিনি তাদের একতা নির্মান করে এবং তাদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করেন। সম্ভাজি মহারাজের মৃত্যুর পর ১১ বছর পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সাহস ও ধর্মপূর্বক ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করেন। রাজারাম মহারাজের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল অত্যন্ত কঠিন সময়ে স্বরাজ্য রক্ষা করা। জমিদার (জমিদারী) গো. স. সরদেসাই ছত্রপতিকে বর্ণনা করতে 'স্থিরবুদ্ধি' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। তাহার এই উল্লেখ সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয়।

করে দেখো।

- তোমাদের অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী মহিলাদের সাক্ষাৎকার নেও।

মহারানী তারাবাই: ছত্রপতি রাজারাম মহারাজের মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব ভেবেছিল যে সে সংগ্রাম জয়ী হয়েছে। তবে পরিস্থিতি মাত্র বিপরীত ছিল। ঔরঙ্গজেব একের-পর এক যুদ্ধ জয়ী করছিল কিন্তু সে সম্পূর্ণ যুদ্ধ জয়ী করতে পারছিলনা। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্বরাজ্য পরিচালনার জন্য রাজারাম মহারাজের কর্তব্যপরায়ন স্ত্রী মহারানী তারাবাই এগিয়ে আসেন।

মহারানী তারাবাই

মুঘল ইতিহাসকার খাফিখান মহারানী তারাবাইকে নিম্নলিখিত শব্দে বর্ণনা করেছেন, তিনি (তারাবাই) বুদ্ধিমানী এবং জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সন্য পরিচালনা এবং রাজ্য প্রশাসন বিষয়ে তার স্বামী থাকাকালীন তাঁর খ্যাতি বহু দূর-দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল ।

ছত্রপতি রাজারাম মহারাজের মৃত্যুর পর মহারানী তারাবাই তার প্রধানদের সহায়তায় অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্বরাজ্যের সংগ্রাম চালিয়ে যান। ঔরঙ্গজেব মারাঠীদের অঞ্চল সাতারা, পান্হাল জয় করে এবং মারাঠারা মুঘলদের মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত পর্যন্ত পৌছে যায়। তারাবাই যুদ্ধের ক্ষেত্র বিস্তারিত করে। কৃষ্ণাজী সাবন্ত, সন্তেরাও, দাভার্ডে, ধনাজী জাধব, নেমাজী শিন্দে এই সরদাররা মহারাষ্ট্রের বাইরে যুদ্ধ করতে লাগল। এই যুদ্ধর গতিপথ পরিবর্তনের একটি ইঙ্গিত ছিল।

মহারানী তারাবাই সাত বছর সংগ্রাম বা সংঘর্ষ করেছিলেন এবং রাজ্যের রক্ষা করেন। সমস্ত প্রশাসন নিজের অধিনে নিয়ে তিনি স্বরাজ্যের কাজে সম্পূর্ণ সরদারদের সাথে যোগ দেন। মারাঠা সরদার সিরোজ, মন্দসৌর, মালবা পর্যন্ত পৌঁছে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। খাফী খান লিখেছেন, রাজারামের স্ত্রী তারাবাই বিলক্ষণ বিপজ্জনক সংগ্রাম শুরু করেন ।

তুমি জানো কি?

মহারানী তারাবাই গুরিল্লা (ছাপামারা) যুদ্ধ কৌশল খুবই ভালো ব্যবহার করতেন। ঔরঙ্গজেবের সেনার সামনে মারাঠাদের শক্তি ছিল খুব কম। দুর্গ জয় করার জন্য ঔরঙ্গজেব দুর্গ ঘিরে নিত। যতদিন সম্ভব মারাঠারা দুর্গের জন্য যুদ্ধ করত। বর্ষাকাল সামনে আসতেই মারাঠা দুর্গ রক্ষকরা এমন দেখাতেন যে, তারা অসমার্থ হয়ে গেছে তার পর ঔরঙ্গজেবকে প্রলোভন দেখিয়ে ধনরাষি নিয়ে দুর্গতাঁকে দিয়ে দিত এবং দুর্গ রক্ষক সেই ধনরাষি মারাঠা খাজানায় বা কোষাগারে জমা করতেন। ঔরঙ্গজেব, দুর্গে যখন শস্য, ধান্য, গোলা-বারুদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখতো তখন তারাবাই পুনরায় ওই দুর্গ জয় করে নিতেন। মহারানী তারাবাইয়ের যুদ্ধ কৌশলগুলিকে ‘সেফ ডিপোজিট লকার সিস্টিম’ এই রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাদের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এবং যুদ্ধ নীতির গুণ চর্তুরদিকে তীব্রতার সহিত ছড়িয়ে পড়ে। অতএব দিন-দিন মারাঠাদের আক্রমন এবং তাদের বিপজ্জনক সংগ্রাম বেড়ে গেল।

তুমি জনো কি ?

তারাবাইয়ের কীর্তি বর্ণনা 'শিবভারতকার' পরমানন্দের পুত্র কবি দেবদত্ত বলেন যে,

তারাবাই রামরাণী। ভদ্রকালী কোপালী।
দিল্লী দীনবানী। দিল্লীশাচে গেলে পানী।
রামরানী ভদ্রকালী। রনরঙী ক্রুদ্ধ ঝালী।
প্রয়ত্নাচী বেঢ় আলী। মুঘল হো সাম্ভাড়া ॥

এইভাবে ছত্রপতি শিরাজী মহারাজের পরাক্রম ও বীরতার উত্তরাধিকার মহারানী তারাবাই করেন।

মারাঠাদের এই আক্রমণাত্মক আক্রমনে ঔরঙ্গজেব হতাশ হয়ে পড়ে। প্রায় পঁচিশ বছর মুঘল ও মারাঠীদের সংগ্রাম সুরু ছিল । মারাঠীদের পরাজয় করা মুঘলদের পক্ষে সম্ভব হল না। এই পরিস্থিতে ১৭০৭ খ্রীষ্টাবদে ঔরঙ্গজেবের অহমদনগরে মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে মারাঠাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয়।

মারাঠাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল মুঘল শাসকদের দ্বারা সাম্রাজ্যের লালশা এবং মারাঠাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে লড়াই। এই লড়াইতে মারাঠারা জয়ী হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়ে মারাঠারা ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা পূরনে অগ্রসর ছিলেন। তাঁরা দিল্লির সিংহাসন নিয়ন্ত্রন করে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে শাসন ও রক্ষা করেছিলেন । তাই অষ্টাদশ শতাব্দীকে মারাঠাদের শতাব্দী হিসেবে ধরা হয়। এই শতাব্দীতে মারাঠাদের কৃতিত্বের ইতিহাস আমরা পরবর্তী পাঠে দেখব।

ভোঁসলে পরিবারের বংশ পরিচয়

মালোজীরাজে
↓
শহাজীরাজে
(খ্রিষ্ট ১৫৯৪ থেকে ১৬৬৪)
↓
- **সম্ভাজী**
- **ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ** (খ্রিষ্ট ১৬৩০ থেকে ১৬৮০)
  - **ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজ** খ্রিষ্ট ১৬৫৭ থেকে ১৬৮৯)
    - ↓ **ছত্রপতি শাহু মহারাজ** (খ্রিষ্ট ১৬৮২ থেকে ১৭৪৯)
      - ↓ **ছত্রপতি রাজারাম** (দত্তক খ্রিষ্ট ১৭৫০ থেকে ১৭৭৭)
  - **ছত্রপতি রাজারাম মহারাজ** (খ্রিষ্ট ১৬৭০ থেকে ১৭০০)
    - **ছত্রপতি শিবাজী** (তারাবাই পুত্র)
      - ↓ **রাজারাম** (সাতারা *গদ্দী* দত্তক)
    - **ছত্রপতি সম্ভাজী** (রাজসবাই পুত্র)
- **ব্যাঙ্কোজী**

অনুশিলনী

১. উচিৎ বিকল্প নির্বাচন করো।

(১) ঔরঙ্গজেবের পরাক্রমে এস্ত হয়ে গিয়েছিল।
   (অ) শাহজাদা অকবর
   (ব) ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজ
   (ক) ছত্রপতি রাজারাম মহারাজ

(২) বাদশাহের তাঁবুর উপর থেকে সোনার কলস কেটে নিয়ে গিয়েছিলেন।
   (অ) সন্তাজী এবং ধনাজী
   (ব) সন্তাজী ঘোরপড়েও বিঠোজী চাব্হান
   (ক) খন্ডো বল্লাল এবং রুপাজী ভোসলে।

(৩) গোয়ার যুদ্ধে বীরত্বের পরিচালনা করেন।
   (অ) এসাজী কঙ্ক
   (ব) নেমাজী শিন্ধে
   (ক)প্রলাদ নিলাজী।

২. পাঠে খুঁজে লেখো।

(১) সম্ভাজী মহারাজকে জিঞ্জিরার অভিযান আধাআধি ছেড়ে দিয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল কেন?

(২) সম্ভাজী মহারাজ পর্তুগালিদের শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

(৩) রাজারাম মহারাজ জিঞ্জি যাওয়ার পথে স্বরাজ্যের রক্ষার দায়িত্ব কাকে দিয়েছিলেন?

(৪) মহারাণী তারাবাইয়ের পরাক্রমের কথা কবি দেবদত্ত কোন শব্দে বর্ণনা করেছেন ?

৩. কেন তাহা লেখো।

(১) ঔরঙ্গজেব তার মোর্চা আদিলশাহী এবং কুতুবশাহির দিকে প্রসারিত করে।

(২) সম্ভাজী মহারাজের পরে মারাঠা মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হল ।

(৩) মহারানী ইসুবাইয়ের নেতৃত্বে রায়গড়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উপক্রম

ভারতের মানচিত্রে গোয়া, বীজাপুর, গোলকোন্ডা, জিঞ্জি, অহমদাবাদ এবং অহমদনগর দেখাও।

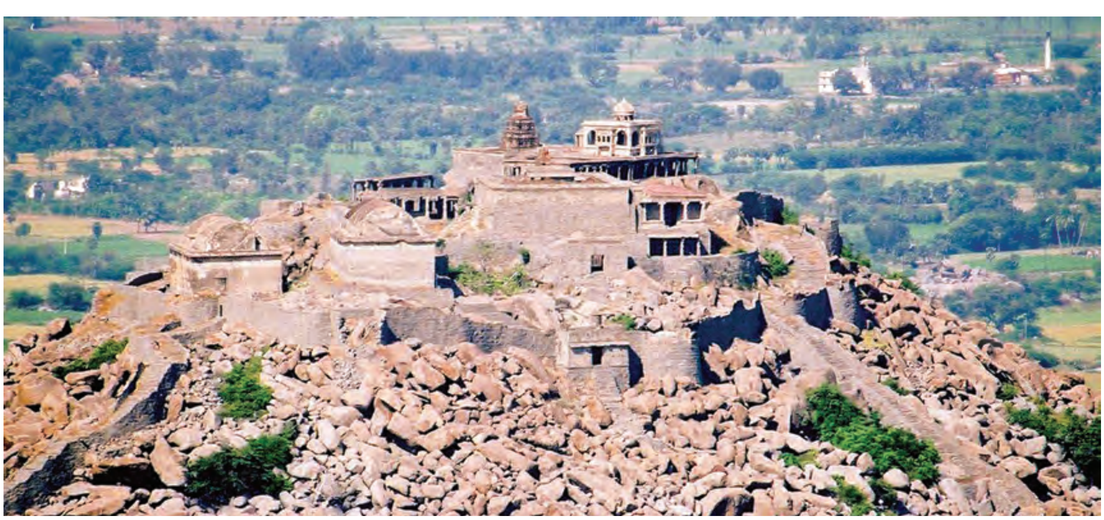

জিঞ্জির দুর্গ

১০. মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার

মারাঠাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে মুঘল শক্তি আক্রমনাত্মক ছিল, অন্য দিকে মারাঠাদের নীতি ছিল প্রতিরক্ষামূলক। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি উল্টে গেল। মারাঠারা আক্রমনাত্মক এবং মুঘল প্রতিরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে মারাঠারা মুঘল শক্তিকে পরাজিত করে এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তার করেছিলেন। তাঁর অধ্যয়ন আমরা এই পাঠে করবো।

শাহু মহারাজের মুক্তি: ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে দিল্লির সিংহাসনের জন্য সংগ্রাম শুরু হয়। শাহাজাদা আজম শাহ দক্ষিণ প্রান্তে ছিল। সে রাজ সিংহাসন পাওয়ার আশায় অতি শিঘ্রে দিল্লির দিকে গমন করলো। রাজকুমর শাহু তাদের দখলে ছিল বা তাদের বন্দিতে ছিল। মহারাজকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিলে মহারানী তারাবাই এবং শাহু মহারাজের মধ্যে ছত্রপতির সিংহাসনের জন্য ঝগড়া হবে এবং মারাঠাদের ক্ষমতা নির্বল হয়ে যাবে। এমন আজম শাহা ভেবেছিল। তাই সে শাহু মহারাজকে মুক্তি করে।

শাহু মহারাজের রাজ্যাভিষেক: বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে শাহু মহারাজ মহারাষ্ট্রের দিকে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন মারাঠা প্রধান মিলে যায়। কিন্তু মহারানী তারাবাই ছত্রপতি পদে শাহু মহারাজের দাবি মেনে নেননি। পুনে জেলার ভীমা নদীর তীরে খেড় নামক স্থানে শাহু মহারাজ এবং মহারানী তারাবাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শাহু মহারাজ জয়ী হয়। তিনি সাতারা জয় করেন এবং নিজেই রাজ্যাভিষেক করায়। সাতারা মারাঠা রাজ্যের রাজধানী হয়।

শাহু মহারাজ

কিছুকাল শাহু মহারাজ ও মহারানী তারারাইয়ের মধ্যে বিরোধিতা চলতে থাকে। ই.স. ১৭১০ সালে সে মহারানী তারাবাই পন্হালগড়ে তাঁর যুবক পুত্র শিবাজী (দ্বিতীয়) ছত্রপতি হিসাবে ঘোষনা করেন। তখন থেকে মারাঠী শাসনের অধীনে সাতারা রাজ্য ছাড়াও কোলহাপুর নামে একটি স্বাধীন রাজ্য অস্তিতে আসে।

শাহু মহারাজের পূর্ব জীবন মুঘল শিবিরে অতিবাহিত হওয়ায় তিনি মুঘলদের রাজনীতিকে কাছ থেকে দেখতে পান। উত্তর ভারতের রাজনীতি তিনি অনেক নিকট থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। মুঘল শাসনের শক্তিশালী পক্ষ এবং দুর্বল পক্ষ সম্পর্কে তিনি ভালভাবে অবগত ছিলেন। এবং মুঘল দরবারে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়। এই সমস্ত কারনগুলির ব্যবহার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মারাঠা রাজনীতির গতিপথ নির্ধারনের জন্য হয়।

মারাঠা রাজ্য নষ্ট করা ঔরঙ্গজেবের নীতি ছিল কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই নীতি ত্যাগ করে ছিল। ফলত মুঘল সত্তার সঙ্গে সংঘর্ষ না করে তাদের রক্ষার জন্য আগে আসা এবং ইহার থেকে সত্তার বিস্তার করা এই নতুন নীতি মারাঠারা ব্যবহার করল। একটি নতুন মন্দির নির্মানের দ্বারা যে পূণ্য পাওয়া যায় তা একটি পুরানো মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে পাওয়া যায় এটি নীতিসূত্র ছিল।

মুঘল সত্তার যতটা ভয় পশ্চিম উত্তর থেকে ইরান, আফগানীদের আক্রমনের থেকে ছিল তেমন ভয় স্থানীয় শাসক যেমন পাঠান, রাজপুত, জাট, রুহেলা তাদের থেকেও ছিল। তাছাড়া দরবারে প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম চলার কারণে মুঘল সত্তা ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ কারণে দিল্লির দরবারে মারাঠাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

বালাজী বিশ্বনাথ: শাহু মহারাজ মুঘলদের বন্দি থেকে মুক্তি হওয়ার পর তিনি বালাজী বিশ্বনাথকে

পেশওয়া বানিয়েছিলেন। বালাজী মূলত কোকনের শ্রীবর্ধন গ্রামের ছিলেন। তিনি ছিলেন কর্তব্যবান এবং অনুভবী। শাহু মহারাজ হলেন মারাঠাদের উত্তরাধিকারী এমন সরদারদের বুঝিয়ে তাদের শাহু মহারাজের পক্ষে করে নেয়।

কানহোজী আংরে মারাঠা নৌসেনার প্রধান ছিলেন। তিনি মহারানী তারাবাইয়ের পক্ষ নেয় এবং শাহু মহারাজের প্রদেশে আক্রমন করে। শাহু মহারাজের সম্মুখে বিকট পরিস্তিতি এসে দাড়ায় এই পরিস্থিতিতে বালাজীকে কানহোজী আংরের বিরুদ্ধে পাঠায়। বালাজী যুদ্ধ ছেড়ে কুটনীতির দ্বারা কানহোজীকে শাহু মহারাজের পক্ষে করে নেয়।

চতুর্থ সর্দেশমুখীর আদেশপত্র (সনদ) : মহারাষ্ট্রে শাহু মহারাজের স্থান সুসংহত করার পর বালাজী উত্তরের রাজনীতিতে মনোযোগ দেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির দরবারে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। সেখানে সাইয়্যেদ ভাই আবদুল্লাহ (হাসান) ও হুসেন আলীর আধিপত্য তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তাদের সাহায্যে বালাজী ই.স. ১৭১৯ সালে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে দক্ষিণাত্যের মুঘল অঞ্চল থেকে কিছু জ ায়গায় এক চতুর্থাংশ এবং অন্য জায়গায় একটি সরদেশমুখী পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সনদ বা আদেশপত্র প্রাপ্ত করেন। এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ভূ-রাজস্বের এক চতুর্থাংশ, আর সরদেশমুখী অর্থাৎ এক দশমাংশ।

বাজীরাও প্রথম : শাহু মহারাজ বালাজী, বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাজীরাও (প্রথম) কে ই.স. ১৭২০ সালে পেশওয়া পদে নিযুক্ত করেন। তিনি তার পেশওরা পদের কুড়ি বছরের কার্যকালে মারাঠা সত্তার বিস্তার করে।

বাজীরাও প্রথম

পালখেড়ে নিজামের পরাজয় : মুঘল বাদশাহ ফরুকসিয়ার নিজাম-উল-মুল্ককে দক্ষিনের শুভেদার পদে নিযুক্ত করে ই.স. ১৭১৩ সালে নিজাম হায়দ্রাবাদে নিজের আলাদা স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। সম্রাট মারাঠাদের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এক চতুর্থাংশ এবং দৃশমাংশ আদায় করার অধিকার দিয়েছিলেন। নিজাম এই অধিকারের বিরোধ করে। তিনি পুনে পরগনার কিছু অংশ জয় করে। বাজীরাও নিজামকে প্রতিবন্ধ লাগানোর প্রচেষ্টা করে। তিনি ঔরঙ্গাবাদের কাছে পালখেড়ে নিজামকে পরাজিত করেন। তারপর তিনি মারাঠাদের চতুর্থাংশ-দশমাংশ পুনরুদ্ধারের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

বাজীরাও জানতেন যে মুঘল সত্তা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই বাজীরাও উত্তরে সত্তা বিস্তার করার জন্য বেশী সময় দেয়। এবং শাহু মহারাজ বাজীরাওকে তার নীতিকে সমর্থন দেয়।

মালওয়া : বর্তমান মধ্যপ্রদেশের মালওয়া অঞ্চল। এই এলাকা মুঘলদের দখলে ছিল। বাজীরাও তাঁর নিজের ভাই চিমাজী আপ্পার নেতৃত্বে মালহাররাও হোলকর, রানোজী সিন্ধে এবং উদাজী পাওয়ারকে মালওয়ায় পাঠান। সেখানে - তাঁরা তাদের কেন্দ্র স্থাপন করে।

বুন্দেলখন্ড : বুন্দেলখন্ড হল বর্তমান মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের ঝাঁশী, পন্না, সাগর এবং অন্যান্য শহরের আশেপাশে অবস্থিত একটি অঞ্চল।

রাজা ছত্রশাল বুন্দেলখণ্ডে তাঁর স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এলাহাবাদের সুবেদার মুঘল মুহাম্মদ খান বঙ্গশ বুন্দেলখণ্ডে আক্রমন করে। তিনি ছত্রসালকে পরাজিত করে। ছত্রসাল তখন বাজীরাওকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।

রাজীরাও বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বুন্দেলখণ্ডে যান। তিনি বঙ্গশকে পরাজিত করেন। ছত্রশাল বাজীরাওকে শ্রদ্ধা জানান। এভাবে মারাঠারা মালওয়া ও বুন্দেলখণ্ডে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

তুমি জনো কি ?

ছত্রশাল বাজীরাওকে সাহাজ্যের জন্য পত্র লেখেন। তাতে তিনি লিখেছেন, যো গত আহ গজেন্দ্রকী বহ গত আয়ী হ্যায় আজ বাজী জান বুন্দেলকী, বাজী রাখো লাজ (অর্থাৎ আমার অবস্থা খুবই দয়নীয় হয়ে গিয়েছে যেমন কি একটি কুমির তাঁর মুখে একটি গজেন্দ্রের (হাতী) পা কামড়ে রেখেছে। আমি এখন বড় সমস্যায় আছি। এখন আমার সাহায্য আপনি করতে পারেন)

বাজীরাও সম্রাটের কাছে মালওয়ার সুবেদারি দাবি করেন। তিনি এই দাবি অমান্য করে। তাই বাজীরাও ১৭৩৭ সালের মার্চ মাসে দিল্লী সীমান্তে অগ্রসর হন।

ভোপালের যুদ্ধ: বাজীরাওয়ের আক্রমনে মুঘল শাসক বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি দিল্লী রক্ষার জন্য নিজামকে তলব করেন। নিজাম বিপুল সেনা নিয়ে বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে আক্রমন করে। বাজীরাও তাকে ভোপালে পরাজিত করেন। নিজাম মারাঠাদের সুবেদারী সনদ বা আদেশপত্র মুঘল শাসকের নিকট থেকে প্রাপ্ত করে দেওয়া জন্য মান্য করে।

পর্তুগিজদের পরাজয়: কোকন উপকূলের বসই এবং ঠানে পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রন ছিল। পর্তুগিজ শাসকরা জনগনের উপর অত্যাচার করতো। বাজীরাও তাঁর ভাই চিমাজী আপ্পাকে তাদের দমন করার জন্য পাঠান। তিনি ঠানে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করেন। তারপর তিনি ১৭৩৯ সালে বসইয়ের দুর্গ ঘেরা করে। সেই দুর্গ ছিল খুবই মজবুত পর্তুগিজদের কাছে প্রভাবকারী তোফ ছিল। কিন্তু চিমাজী আপ্পা তাঁর কৌশলে পর্তুগিজদের আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করেন। ফলস্বরূপঃ বাসাই দুর্গ এবং পর্তুগিজদের অঞ্চল অধিকাংশ মারাঠাদের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে।

বাজীরাওয়ের মৃত্যু: ইরানের সম্রাট নাদির শাহ ভারতে আক্রমন করে। শাহু মহারাজের আদেশে বাজীরাও একটি বিশাল সেনা নিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। তিনি বরহানপুরে পর্যন্ত পৌছায় কিন্তু সে পর্যন্ত নাদির শাহ দিল্লীর বিপুল সম্পত্তি লুটমার করে নিজের দেশে ফিরে যায়। এপ্রিল ১৭৪০ সালে নর্মদা নদীর তিরে রাবের খেড়ী নামক স্থানে বাজীরাওসের মৃত্যু হয়।

বাজীরাও উত্তম সেনানী ছিলেন। বাজীরাও তাঁর বীরতা এবং পরাক্রমে উত্তর ভারতে মারাঠাদের অধিপত্ব স্থাপিত করেন। তিনি মারাঠা সত্তাকে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী সত্তা রূপে স্থান প্রাপ্ত করায়। বাজীরাওয়ের কার্যকালে শিন্দে, হোলকর, পাত্তয়ার এবং গায়কওয়াড় পরিবার (ঘরানা) এগিয়ে আসে।

অনুশিলনী

১. কাকে বলে।

(১) চতুর্থাংশ –

(২) সরদেশমুখী –

২. এক বাক্যে লেখো।

(১) বালাজী মূলতঃ কোকনের এই গ্রামের ছিলেন ....

(২) বুন্দেলখন্ডে এনার রাজ্য ছিল ....

(৩) বাজীরাওয়ের মৃত্যু এই স্থানে হয় ....

(৪) পর্তুগিজদের পরাজয় ইনি করেছেন ....

৩. লেখন করো

(১) কানহোজী আংরে (২) পালাখেড়ের যুদ্ধ

(৩) বালাজী বিশ্বনাথ (৪) বাজীরাও প্রথম

৪. কারন লেখো

(১) মারাঠা সাম্রাজ্যে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়।

(২) আজম শাহ ছত্রপতি শাহু মহারাজকে মুক্ত করেন ।

(৩) দিল্লীর শাসককে মারাঠাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

উপক্রম

মহারানী তারাবইয়ের চরিত্র সংগ্রহ করো এবং শ্রেনীকক্ষে অভিনয় সহ তার জীবনের সেই ঘটনাগুলি প্রস্তুত করো ।

১১. রাষ্ট্ররক্ষক মারাঠা

বাজীরাওয়েরপর শাহু মহারাজ তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও অর্থাৎ নানা সাহেবকে পেশোয়াই পোশাক দেন। নাদির শাহের আসনে দিল্লীতে অস্থীতিশীলতা তৈরী হয়। এমন সময় তিনি উত্তরে মারাঠাদের সত্তাকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। এমন সময় আহ্মদ শাহ আবদালি পানিপথে মারাঠীদের সম্মুখে আহ্বান নির্মান করে। এই পাঠে আমরা এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে জানব।

উত্তরের পরিস্থিতি: অযোধ্যাপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের নিচে অবস্থিত অঞ্চলটি অষ্টদশ শতকে রৌহিলখণ্ড নামে পরিচিত ছিল। আফগানিস্তান থেকে আসা পাঠানরা এই এলাকায় বসতি স্থাপন করে। তাই পাঠানদের রোহিল বলে। গঙ্গা-যমুনা নদীর তিরে দোয়াব অঞ্চলে তাঁরা এই রোহিলেরা খুবই উৎপাত শুরু করে । তাদের দমন করার জন্য অযোদ্ধার নবাব মারাঠাদের আমন্ত্রিত করে। মারাঠারা রুহেলদের দমন করে।

আফগানদের সাথে সংঘর্ষ: আফগানিস্তানের সম্রাট আহ্মদ শাহ আবদালীর ভারতের সম্পদের বা সম্পত্তীর উপর লোভ ছিল। ই.স. ১৭৫১ সালে সে পাঞ্জাবে আক্রমন করে। এই সময় মুঘল অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই মুঘলরা আবদালীর আক্রমণে ভীত ছিল। এমতাবস্থায় মুঘলরা তাদের সুরক্ষার জন্য মারাঠাদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন মনে করে। মুঘল শাসকদের মারাঠাদের শক্তি এবং সত্তার উপর বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। দিল্লী রক্ষার জন্য মারাঠাদের মতো শক্তিশালী আর কোন সত্তার মধ্যে ছিল না। তাই মুঘল শাসক ই.স. ১৭৫২ সালের এপ্রিল মাসে মারাঠাদের সাথে একটি চুক্তি করে। এই চুক্তি অনুসারে মারাঠীরা মুঘল শক্তিকে রোহিলা, জাট, রাজপুত্র, আফগান প্রভৃতি শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে সম্মত হয়। তাঁর বিনিময়ে মারাঠাদের নগদ টাকা দেওয়া হবে বলেছিল। তাঁর ব্যাতিরিক্ত পাঞ্জাব, মুলতান, রাজপুতানা, সিন্ধু ও রোহিলখন্ড থেকে চতুর্থাংশ আদাই করার অধিকারও পেয়েছিলেন। এছাড়াও আজমের এবং আগ্রার সুবেদারী দেওয়া হয়েছিল।

এই চুক্তি অনুসারে ছত্রপতির পক্ষ থেকে পেশওয়ারা দিল্লী রক্ষার জন্য শিন্দে- হোলকরদের সৈন্য পাঠায়। মারাঠারা দিল্লীর দিকে রওনা হয়েছে। এই খবর শুনে আবদালী নিজের দেশে ফিরে যায়। মারাঠারা ধাপের পর ধাপ পার করে দিল্লী পৌঁছে যায়। মারাঠীদের জন্য আবদালীর সঙ্কট এড়ায়। তাই মুগল শাসক তাদের মুগল সুবাহের এক চতুর্থাংশের অধিকার দেয়। এই সুবাহগুলির মধ্যে কাবুল এবং কান্দাহার ও পেশবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সুবাগুলি পূর্বে মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ ছিল কিন্তু এখন ছিল আবদালীর আফগানিস্তানে। চুক্তি অনুসারে সুরা আবদালীর কাছ থেকে জয় করা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে পুনর্মিলন করা মারাঠীদের দায়িত্ব ছিল। এর বিপরীত আবদালী চেয়েছিল যে পাঞ্জাব অঞ্চল পর্যন্ত আফগানের নিয়ন্ত্রণে আনার। অতএব, শীঘ্রই বা পরে মারাঠী এবং আবদালীর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল।

নানাসাহেব পেশবার ভাই রঘুনাথরাও জয়াপ্পা শিন্দে এবং মালহাররাত্তকে নিয়ে উত্তর ভারতে আবদালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অভিযানে যান।

পেশওয়া নানাসাহেব

উত্তর ভারতের স্থানীয় শাসকদের দৃষ্টিকোন থেকে দক্ষিণের মারাঠারা ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠাদের ব্যাপক দৃষ্টিকোন সামনে রেখে মারাঠীদের সাহায্য করার পরিবর্তে তারা নিরপক্ষ

থাকে। 'দিল্লীর দরবারে মারাঠাদের আধিপত্য ও হস্তক্ষেপ তাদের মান্য ছিল না। কিন্তু সুরজমল জাট এবং রানী কিশোরীও পানিপথ যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সাহায্য করেছিলেন।

উত্তরে কিছু মৌলবাদী মারাঠাদের পরধর্মীয় হিসেবে দেখেতেন। তারাও মারাঠীদের ব্যাপক দৃষ্টিকোন বোঝার চেষ্টাও করেননি। বরং মারাঠাদের আধিপত্য কম হওয়া উচিত, তাই আবদালীকে ভারতে আক্রমনের আহ্বান জানায়। তারা আশা করেছিল যে আবদালী মারাঠাদের পরাজিত করে এবং তাদের দক্ষিণে নর্মদা নদীর তিরে পার করে দেবে।

অটকে মারাঠীদের পতাকা উত্তোলন: নাজীব খান ছিলেন রুহেলদের প্রধান। উত্তর ভারতে মারাঠাদের প্রভাব তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। নাজীব খানের নির্দেশে আবদালী পুনরায় ভারতে আক্রমন করে। এটি ছিল তাঁর ভারতে পঞ্চম আক্রমন। সে দিল্লী জয় করে এবং ব্যাপক লুটপাটের পর আফগানিস্তানে ফিরে আসে। রঘুনাথরাও এবং মালহাররাও পুনরায় উত্তরে গেলেন। তাঁরা দিল্লী জয় করে আবদালীর সরদারদের তাড়িয়ে পাঞ্জাব জয় করে। আবদালীর সেনার পিছা করতে-করতে মারাঠারা ই.স. ১৭৫৮ সালে অটক প্রর্যন্ত পৌছায়। অটকে মারাঠাদের পতাকা উত্তোলন করা হয়। অটক এই স্থানটি বর্তমানে পাকিস্তানে। মারাঠারা এই অভিযান আটকের আগে পেশওয়ার পর্যন্ত চালায় কিন্তু মারাঠারা নিজের অধিকারের অঞ্চলগুলির পরিচালনা করতে সফল হয়নি।

দত্তজীর পরাক্রম : পাঞ্জাবের উপর দখল করার জন্য এবং নাজীব খানকে দমন করার জন্য পেশওয়া দত্তজী শিন্দে এবং জানকোজী শিন্দেকে উত্তরে পাঠান। দত্তজী উত্তরে গেলেন। নাজীব খান তাকে কথায় জড়িয়ে রাখে এবং আবদালীর কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করে। এই খবর পাওয়া মাত্রই আবদালী পুনরায় ভারতে আক্রমন করে। যমুনার তীরে বুরারী ঘাটে দত্তজী ও আবদালী মুখোমুখি হলেন। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দত্তজী, অসাধারন পরাক্রম করে। কিন্তু দত্তজী বীরগতি লাভ করেন ।

তুমি জানো কি ?

দত্তজী অত্যন্ত ধৈর্য ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, রুহেলা নাজীব খানের সলাহকার কুতুবশাহ হাতি থেকে নেমে আহত দত্তজীর কাছে এসে দত্তজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিউ পটেলজী, হমারে সাথে তুম অওর ভী লড়েঙ্গে?' দত্তজী মাটিতে পড়ে ছিলেন কিন্তু কুতুব শাহের এই কথাগুলি শুনে তিনি পূর্ণ আত্মমর্যাদার সহিত উত্তর দিলেন, 'হাঁ বচেঙ্গে তো অওর ভী লড়েঙ্গে।'

সদাশিবরাও ভাউ : নানাসাহেব আবদালীকে দমন করার জন্য তার কাকাতো ভাই সদাশিবরাও ভাউ এবং তার জ্যেষ্ট পুত্র বিশ্বাসরাওকে উত্তরে পাঠান। সদাশিবরাও ভাউ ছিলেন চিমাজী আপ্পার পুত্র। তার সাথে ছিল বিশাল সেনাবাহিনী ও শক্তিশালী কামান। ইব্রাহিম খান গার্দীছিল কামানের প্রধান। এই কামানের জোরেই তিনি ই.স. ১৭৬০ সালে লাতুর জেলার উদগীরের যুদ্ধে নিজামকে পরাজিত করেছিলেন ।

সদাশিবরাও ভাউ

পানিপথের যুদ্ধ : উত্তরের এই অভিযানে সদাশিবরাও ভাউ দিল্লী জয় করেন। তারপর পানিপথে মারাঠী সেনা এবং আবদালীর সেনা মুখোমুখি হয়। ই.স. ১৪ জানুয়ারি ১৭৬১ সালে মারাঠারা আবদালির উপর আক্রমন শুরু করে। এটি ছিল পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিশ্বাসরাওয়ের গুলি লাগার কারণে মৃত্যু হয়। এই খবর সদাশিবরাও পাওয়া মাত্রই তিনি ক্রোধিত হয়ে পাগলের মত শত্রুর উপর আক্রমন করে। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে তাকে দেখা দুষ্কর হয়ে গিয়েছিল। আমাদের নেতাকে দেখা যাচ্ছেনা তা দেখে, মারাঠী সেনাদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়ে। এমন সময় আবদালীর সংরক্ষিত সৈন্যরা ও তাজা সশস্ত্র সৈন্যরা মারাঠীদের উপর আক্রমন করে। মারাঠারা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রের একটি সম্পূর্ন তরুন পিড়ী সমাপ্ত হয়ে যায়। অনেক সাহসী ও পরাক্রমী সরদার বীরগতি প্রাপ্ত করে।

তুমি জানো কি ?

পানিপথের এই যুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ্য লোক নিহত হয়েছিল। একটি পত্রে দেওয়া প্রতীকী বর্ণনাটি নিম্নরূপে :

“দোন মোত্যে গড়ালী। সত্তাবীস মোহরা হরওলী! আনি রুপযে, খুর্দা কিতী গেল্যা য়াচী গনতীচ নাহী।”

মারাঠাদের মত ছিল যে বিদেশী আবদালীর এখানে শাসন করার কোনো নৈতিক অধিকার নেই। এই ব্যাপক উদ্দেশ্য নিয়ে মারাঠারা আবদালীর সাথে যুদ্ধ করেছিল। আমরা সবাই ভারতীয় এবং আবদালী একজন বিদেশী শত্রু। এই ধরনের পত্র লিখে সদাশিবরাওভাউ উত্তরের সমস্ত শাসকদেরকে মারাঠীদের ব্যাপক ও সর্বব্যাপী ভূমিকা সম্পর্কে জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু এই ভূমিকার সাথে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু উত্তরের শাসকরা সমর্থন দেয়নি এবং তারা নিরপক্ষছিল। ফলে ভারতের রক্ষার দায়িত্ব একই মারাঠাদের উপর পড়ে। তাই বলা যায় যে ভারত এক দেশ তাঁর শাসক কোনো ধর্মের থাকতে পারে; তবুও সবাই তাঁকে সমর্থন করা উচিৎ; এই উপলব্দি ইতিহাসে প্রথম মারাঠারা জাগিয়েছিলেন।

পেশওয়া মাধবরাও : নানাসাহেব পেশওয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মাধবরাও পেশওয়া হন। মাধবরাও তাঁর কর্মজীবনে নিজাম ও হায়দার আলীর ব্যবস্থা করেছিলেন উত্তরে মারাঠাদের আধিপত্য পুনরায় প্রস্থাপিত করেন।

পেশওয়া মাধবরাও

পানিপথের যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়। এই দেখে নিজাম তাদের বিরুদ্ধে গতিবিধি শুরু করে। সে মারাঠাদের অঞ্চলে আক্রমন করে কিন্তু মাধবরাও নিজামকে পৈঠনের নিকট রাক্ষস ভুবন নামক স্থানে পরাজিত করে।

হায়দর আলী মৈসুরের সুল্‌তান ছিল। পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় দেখে সে কর্ণাটকে মারাঠাদের অঞ্চলে আক্রমন করে কিন্তু মারাঠারা তাকে শ্রীরংগাপট্টমের নিকট মোতী তালাব নামক স্থানে যুদ্ধে পরাজয় করে, তখন হায়দর অলী মারাঠাদের উত্তরের তুংগভদ্রা নদীর অঞ্চল দেওয়ার জন্য মান্য করে।

ই.স. ১৭৭২ সালে মাধবরাও পেশওয়ার মৃত্যু হয়। মারাঠাদের ইতিহাসে মাধবরাওকে একজন নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং জনস্বার্থ সচেতন শাসক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরাক্রমশালী *পেশওয়ার* মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যে বিরাট ক্ষতি হয়।

তুমি জানো কি ?

পেশওয়া মাধবরাও কৃষকদের কল্যানের প্রতি বিশেষ ধ্যান দেয়। কূপ খনন করে পুনেতে জল সরবরাহ বৃদ্ধি করে তাঁর শাসন কালে নানা ফড়নবীসের মতো প্রশাসক এবং রামশাস্ত্রী প্রভুনের মতো মহান বিচারক হয়। জনগণ যাতে ন্যায়বিচার পায় সেজন্য বিচার ব্যবস্থায় উন্নতি করা হয়। কামান ও গোলা-বারুদের কারখানা খোলে। সিকী মুদ্রনের জন্য টাকশালের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পেশওয়া মাধবরাওয়ের পর নারায়নরাও এবং সওয়াই মাধবরাও সিংহাসনে বসেন কিন্তু এই দুই পেশওয়া অল্পায়ু ছিলেন। এছাড়া তাদের রাজত্বকালে পেশওয়ারা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এক সময় অটকে পতাকা উত্তলোন করা রঘুনাথরাও সত্তার লালসায় ব্রিটিশদের আশ্রয়ে গিয়েছিল। ফলে মারাঠা এবং ব্রিটিশদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

ই.স. ১৭৮২ সালে হায়দর আলীর মৃত্যু হয়। এরপর তার পুত্র টিপু মহীশুরের সুলতান হন। সে একজন দক্ষ যোদ্ধা হওয়ার সাথে তিনি একজন পণ্ডিত ও কবিও ছিল। সে তাঁর পরাক্রমের দ্বারা রাজ্যের প্রভাব বৃদ্ধি করেছিল। তিনি ফারসিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ব্রিটিশদের প্রভাবে আঘাত শুরু করে। ই.স. ১৭৯৯ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়।

মারাঠী সত্তার প্রভাবের পুনঃস্থাপনা : পানিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত মারাঠাদের প্রতিষ্ঠায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উত্তরে তাদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মাধবরাও মহাদজী শিন্দে, তুকোজী হোলকর, রামচন্দ্র কানডে এবং বিসাজী পন্ত বিনিওয়ালে সর্দারদের উত্তরে পাঠান। মারাঠা সেনারা জাট, রুহেলে এবং রাজপুতদের পরাজিত করে, মুঘল শাসক শাহ আলমকে তাঁর সুরক্ষায় দিল্লীর সিংহাসনে বসায়। এভাবে উত্তরে পুনরায় মারাঠা সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। আবদালীর সেনাবাহিনীরও ক্ষতি হয়। পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করলেও আবদালী আর্থিকভাবে তেমন লাভ করতে পারে না। তাই সে বা তাঁর উত্তরাধিকারীরা পুনরায় ভারতে আক্রমন করার সাহস পায়নি। অপরদিকে তাঁর নজরে এসেছিল যে উত্তরে যে নৈরাজ্য গড়ে উঠেছিল তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মারাঠাদের ছিল। তাই তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে মারাঠারা পাতশাহী রক্ষা করুক। মারাঠাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য সে তাঁর দূতকে পুনেতেও পাঠায়। মারাঠারা পানিপথে এত বড় পরাজয় ভূলে উত্তরের রাজনীতিতে নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছিল, এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মালহাররাও হোলকার, অহিল্যাবাই হোলকার এবং মহাদজী শিন্দের এতে বিরাট অবদান ছিল।

পেশওয়া ঘরানার বংশতালিকা

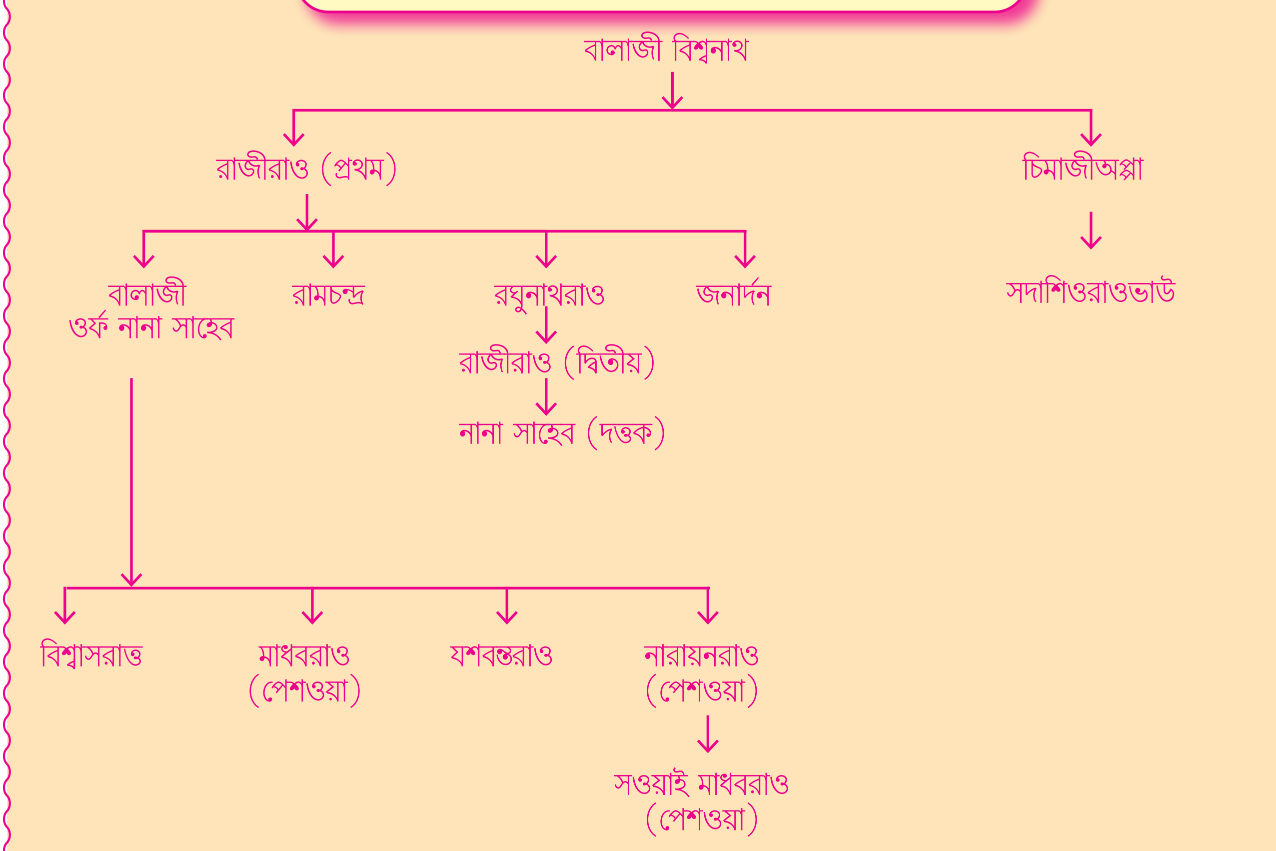

অনুশিলনী

১. কে ভালো?

(১)আফগানিস্থান থেকে আগত...

(২)হিমালয়ের নিচে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে...

(৩)নানাসাহেব পেশওয়ার ভাই...

(৪)মুঘল জাটদের প্রধান...

(৫)পৈঠনের কাছে রাক্ষস ভুবন নামক স্থানে নিজামকে পরাজয় করে তিনি...

২. সংক্ষেপে লেখো।

(১)অটকে মারাঠীদের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

(২)আফগানিদের সাথে সংঘর্ষ।

(৩)পানিপথ যুদ্ধের পরিনাম ।

৩. কালক্রমানুসারে লেখো

(১) রাক্ষস ভুবনের যুদ্ধ

(২) টিপু সুল্তানের মৃত্যু

(৩) মাধবরাও পেশয়ার মৃত্যু

(৪) পানিপথের যুদ্ধ

(৫) বুরাড়ী ঘাটের লড়াই

৪. নিম্ন ছকে পাঠের থেকে আসা ব্যক্তিদের নাম খোঁজ:

ম	স	হ	না	জ	ন	কো	জী
হা	জ	দ	রা	না	ফ	ম	ত্তা
দ	য়া	চ	য়	প	সা	থ	দ
জী	প্পা	ল	ন	আ	রু	হে	প্র
বা	লা	জী	বি	শ্ব	না	থ	ব
অ	ও	লা	মা	ধ	ও	রা	ও
স	দা	শি	ব	বা	ও	ভা	উ
ম	হ্লা	র	রা	ও	ক	চি	দে

উপক্রম

ইন্টারনেটের (আন্তরজাল) সাহায্যে পানিপথ যুদ্ধের তথ্য শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করো ।

সওয়াই মাধব রাও পেশওয়ার দরবার

১২. সাম্রাজ্যের প্রগতি

এপর্যন্ত আমরা মারাঠা সত্তার উত্থান ও বিস্তার দেখেছি। আমরা অধ্যয়ন করেছি কীভাবে *স্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠা থেকে সাম্রাজ্য বিস্তার পর্যন্ত কিভাবে পুর্ন হয়েছে। উত্তর ভারতে মারাঠাদের যে সাম্রাজ্য বিস্তার হয়েছিল। তাতে যে *সরদারদে* গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাদের সংক্ষিপ্ত জানকারী আমরা এই পাঠে দেখবো।

ইন্দোরের হোলকর : মলহাররাও ছিলেন ইন্দোরের হোলকর সত্তার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত মরাঠা রাজ্যের সেবা করেছেন। তিনি গুরিল্লা যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। বাজীরাও প্রথম ও নানা সাহেবের শাসনকালে তিনি উত্তরে পরাক্রম প্রদর্শন করেছিলেন। মালবা ও রাজপুতানায় মারাঠদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার অনেক বড় অবদান ছিল। পানিপথ যুদ্ধের পর উত্তরে মারাঠাদের প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারে মাধবরাও পেশওয়ার অনেক সাহায্য করেন ।

মালহাররাও হোলকর

পুণ্যশ্লোক অহিল্যাবাই ছিলেন মলহাররাওয়ের পুত্র খন্ডেরাওয়ের স্ত্রী। কুম্ভেরির যুদ্ধে খন্ডেরাও মারা যান। পরে মালহাররাওয়ের মৃত্য হয়। এরপর ইন্দোরের শাসনভার চলে আসে অহিল্যাবাইয়ের হাতে। তিনি মহান কূটনীতিক এবং উত্তম প্রশাসক ছিলেন। তিনি নুতন আইন তৈরী করে ভূমি রাজস্ব, কর আদায়ের মতো বিষয়গুলোকে নিয়মতান্ত্রিক রূপে প্রদান করেন। অনুর্বর জমি বীজ রূপনের জন্য ব্যবহার করা, কৃষকদের জন্য কূপ খনন করা, ব্যবসা-বানিজ্যকে উৎসাহিত করা, পুকুর নির্মাণ ইত্যাদির জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।

অহিল্যাবাই হোলকর

তিনি ভারতের চর্তুদিকে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানগুলিতে মন্দির, ঘাট, মঠ, ধর্মশালা, জলদান কেন্দ্র নির্মাণ করেন। এভাবে দেশের সাংস্কৃতির ঐক্যের জন্য তিনি যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা ছিল উল্লেখযোগ্য, তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি একজন মহানদানী এবং গ্রন্থপ্রেমী ছিলেন। তিনি প্রায় আঠাস বছর দক্ষতার সাথে রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা করেন এবং উত্তরে মারাঠা সত্তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছিলেন। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে খুশি করেছেন। মারাঠাশাহীর পতনের সময় যশবন্তরাও হোলকর রাজ্য বাঁচানোর চেষ্টা করেন।

নাগপুরের ভোসলে : নাগপুরের ভোসলে ঘরানার পরসোজি ভোসলেকে শাহু মহারাজের কার্যকালে বরার এবং গোন্ডয়ানা অঞ্চলের সনদ (আদেশপত্র) দেওয়া হয়েছিল। নাগপুরের যত ভোসলে হয়েছিল তাদের মধ্যে রঘুজী ছিলেন একজন পরাক্রমশালী এবং দক্ষ পুরুষ। তিনি দক্ষিণে তিরুচিরাপল্লী এবং আর্কটের আশেপাশের অঞ্চলকে মারাঠাদের আধিপত্যের অধীনে নিয়ে আসেন। শাহু মহারাজ রঘুজীকে বাংলা, বিহার ও উড়িশা অঞ্চলের চতুর্থাংশ পুনরুদ্ধারের অধিকার দিয়েছিলেন। তিনি সেই অঞ্চলগুলিকে মারাঠীদের অধিপত্যের অধীনে নিয়ে আসেন। ই.স. ১৭৫১ সালে নাগপুরের ভোসলেরা

রঘুজি ভোসলে

আলী বরদী খানের কাছ থেকে উড়িশার সুবা জয় করে। কালান্তরে ই.স. ১৮০৩ পর্যন্ত উড়িশায় মারাঠাদের প্রভুত্ব ছিল।

তুমি জানো কি ?

মারাঠা ডিচ - কোলকাতার ব্রিটিশরা নাগপুরের ভোসলেদের ভয় পেত। মারাঠাদের সম্ভাব্য আক্রমন থেকে কোলকাতা শহরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য শহরের চার পাশে একটি খাই বা পরিখা খনন করেছিলেন। এই খাই বা পরিখা মারাঠা ডিচ নামে পরিচিত।

গোয়ালিয়ারের শিন্দে: বাজীরাও প্রথম রানোজী শিন্দের শৌর্য্য এবং পরাক্রম জানতেন। তাঁই তাকে উত্তরের সরদার নিযুক্ত করেন। রানোজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জয়াপ্পা, দত্তজী এবং মহাদজিও তাদের বীরত্বের জোরে উত্তর ভারতে মারাঠী সত্তাকে শক্তিশালী করেছিলেন।

মহাদজি শিন্দে

মাধবরাও পেশওয়া মহাদজিকে শিন্দে পরিবারের সরদার পদ প্রদান করেন। তিনি একজন বীর এবং বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ ছিলেন। পানিপথের পরাজয়ের পর তিনি উত্তর ভারতে মারাঠাদের আধিপত্য ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন । তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে মারাঠাদের গুরিল্লা যুদ্ধ ব্যবস্থা উত্তর ভারতের সমতলভূমিতে কার্যকর হবে না। তাই তিনি ফারসি সেনা বিশেষজ্ঞ ডিবাইনের নির্দেশনায় তাঁর সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেন এবং কামান সজ্জিত করেন। এই প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর জোরে তিনি রুহেল, জাট, রাজপুত, বুন্দেল প্রভৃতিকে আত্মসমর্পন করায়।

পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তি । দুর্বল হয়ে পড়ে এই দেখেই ব্রিটিশরা দিল্লীর রাজনীতিতে প্রবেশ করতে শুরু করে। তাঁরা বাংলা প্রদেশের নাগরিক অধিকার নিজেদের পক্ষে করে নেয়। তাঁরা দিল্লীর বাদশাহকে তাদের নিয়ন্ত্রনে নিতে চেয়েছিল। এই বিপরীত পরিস্থিতিতে মহাদজী শিন্দে ব্রিটিশদের পরাজিত করে পুনরায় দিল্লীর সম্রাটকে সিংহাসনে বসান। এই কাজে খুশি হয়ে দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে ওয়ার্কিল-এ-মুর্তলক উপাধিতে ভূষিত করেন অর্থাৎ দীওয়ানী এবং সৈন্য অধিকার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি এই উপাধি শিশু পেশওয়া সওয়াই মাধবরাওয়ের পক্ষ থেকে গ্রহণ করে। এই উপাধির কারণে দিল্লীর পাতশাহী সম্পূর্ণভাবে মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ক্ষয়িষ্ণু মুঘল শক্তিকে সামলানো সহজ কাজ ছিল না। মহাদজী অত্যান্ত প্রতিকুল পরিস্থিতিতে জয় করে এবং সাহসের সাথে ই.স. ১৭৮৪ থেকে ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত দিল্লীর প্রশাসনের পরিচালনা করে।

পানিপথ যুদ্ধের জন্য দায়ী ছিলেন নাজীব খান। তাঁর উত্তরাধিকারীরা তখনও রোহিল খন্ড থেকে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। নাজীবের নাতি গোলাম কাদির দিল্লীর লাল কেলা নিজে দখল করে নেয় এবং অর্থের জন্য সম্রাট ও বেগমদের উপর অত্যাচার করত। সম্রাটের চোখ বের করে নেয় এবং ধনভাণ্ডার লুট-পাট করে নেয়। এমনতাবস্থায় মহাদজী কাদিরকে পরাজিত করেন এবং কাদিরের দখলকৃত সম্পত্তি নিয়ে সম্রাটকে ফিরিয়ে দেয়। সম্রাট আবার দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। এইভাবে মহাদজী পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পান। দিল্লীর পাতশাহ মারাঠাদের নিয়ন্ত্রনে রেখে ভারতে রাজনীতি চালায়।

পেশওয়াদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলার কারনে রঘুনাথরাও ব্রিটিশদের আশ্রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এক মাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের সহায়তায় পেশওয়া লাভ করা এবং এটি মারাঠী কুটনীতিকদের কাছে গ্রহনযোগ্য ছিল না। অতএব মারাঠা এবং ব্রিটিশদের মধ্যে সংঘর্ষ অটল ছিল। কিন্তু এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে হিন্দুস্থানে শাসন কারা করবে। তাঁর অন্তিম নির্ণয় মারাঠা এবং ব্রিটিশদের মধ্যে হওয়ার ছিল।

ব্রিটিশরা মুম্বাই থেকে বোরঘাট পথে মারাঠাদের আক্রমন করতে এসেছিল। মহাদজী শিন্দের নেতৃত্বে মারাঠা সেনারা একত্রিত হয়। মারাঠারা গুরিল্লা নীতি অনুসরণ করে ইংরেজদের রসদ পেতে দেয়নী। বড়গাঁও (বর্তমানে পুনে-মুম্বাই হাইওয়েতে) দুই সেনা মুখমুখি হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা পরাজয় হয়। ফলে রঘুনাথরাওকে মারাঠাদের হাতে তুলে দেওয়া ব্রিটিশদের জন্য জরুরী হয়ে পড়ে।

দিল্লীতে প্রায় ই.স. ১৮০৩ পর্যন্ত মারাঠাদের নিয়ন্ত্রন ছিল। ব্রিটিশরা ভারত জয় করেছিল কিন্তু মারাঠাদের সাথে যুদ্ধ করে মহাদজী শিন্দের কর্মের গুরুত্ব বুঝতে পারে। দিল্লীর প্রশাসনকে সুব্যবস্থায় এনে তিনি পুনে আসেন। পুনের নিকট বানবাড়ীতে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে তাঁর স্মরণে একটি ছাতা নির্মাণ করা হয়েছে ।

শিন্দের ছাতা, বানবাড়ী-পুনে

শিন্দের ছাতা, বানবাড়ী-পুনে শিন্দে, হোলকর এবং ভোসেলের মতো, আরও কিছু বিশিষ্ট সরদাররা মারাঠী রাজ্যের জন্য অসাধারণ সেবা করেছিলেন।

শিবাজী মহারাজ যে নৌসেনা নির্মাণ করেছিলেন তাকে কানহোজী ও তুলাজী আংগ্রে পিতা-পুত্র মিলে শক্তিশালী তৈরী করেন । এই শক্তিশালি নৌসেনার জোরে তাঁরা পতুর্গিজ, ব্রিটিশ এবং সিদ্দির মতো নৌসেনীকদের সত্তা নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রেখে মারাঠা রাজ্যের উপকূলীয় এলাকা রক্ষা করেন ।

সেনাপতি খন্ডোরাও এবং তাঁর পুত্র ত্রিম্বকরাও গুজরাটে মারাঠী সত্তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। খন্ডোরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী উমাবাই অহমদাবাদের মুঘল সরদারদের পরাজিত করে। সেখানকার দুর্গ জয় করে।

পরবর্তীকালে, গায়কয়াড়রা গুজরাটে বড়োদারা (বরোদা) তাদের সত্তার কেন্দ্রে পরিচিত করে। উত্তরে মারাঠা সত্তার বিস্তারের জন্য মধ্যপ্রদেশের ধার এবং দেওয়াসের পাওয়াররা শিন্দে এবং হোলকরদের মূল্যবান অবদান দিয়েছিলেন।

সেনাপতি মাধবরাও পেশয়ার মৃত্যুর পর মারাঠী রাজনীতি অস্ত- ব্যস্ত (নষ্ট) হয়ে যায়। তাঁকে নানা ফড়নবিস এবং মহাদজী শিন্দে পুনরায় পথে আনে। মহাদজী যখন উত্তর ভারতে মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন নানা দক্ষিণের রাজনীতির ভার নিজ হাতে নেয়। এই কাজে তিনি পটবর্ধন, হরিপন্ত ফড়কে, রাস্তে আদি সরদারদের সহযোগিতা পান। ফলে দক্ষিণে মারাঠী সত্তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোরের হোলকর, নাগপুরের ভোসলে, গোয়ালিয়ারের শিন্দে, বড়দারার গায়কবাড় তাদের পরাক্রম, নেতৃত্ব, কার্য ইত্যাদি গুনের বলে মারাঠা সত্তাকে বৈভবশালী তৈরী করে। এ সকলে ছিল মারাঠী সত্তার শেষ পর্যায়ের স্তম্ভ।

নানা ফড়নবিস

মারাঠা সত্তা উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে প্রভাব তৈরী করতে মারাঠা সরদার সফল হয় কিন্তু মহাদজী শিন্দে এবং নানা ফড়নবিসের মৃত্যুর পর মারাঠা সত্তার পতন শুরু হয়। এই সময়ে রঘুনাথরাওয়ের পুত্র ছিলেন বাজীরাও দ্বিতীয় পেশওয়া। তাঁর নেতৃত্বের

দক্ষতার অভাব ছিল। তার বিপরীতে অনেক দোষ ছিল। তিনি মারাঠা সরদারদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেননি। মারাঠা সরদারদের মধ্যে পারস্পারিক ভেদ সৃষ্টির কারণে মারাঠা সত্তা ভেতর থেকে ফাঁকা হয়ে পড়ে। এরকম অনেক কারণে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের কার্যকালে উত্তর ও দক্ষিণে মারাঠাদের প্রভাব হ্রাস হয় এবং ব্রিটিশরা মারাঠা সত্তার জায়গা দখল করে নেয়।

ই.স. ১৮১৭ সালে, ব্রিটিশরা পুনে দখল করে এবং সেখানে তাদের ইউনিয়ন জ্যাক’ পতাকা স্থাপন করে। ই.স. ১৮১৮ সালে, সোলাপুর জেলার আষ্টিতে একটি যুদ্ধে ব্রিটিশরা মারাঠাদের পরাজিত করে। ফলে মারাঠা সত্তা সমাপ্ত হয়ে যায়। এই ঘটনাটি ভারতীয় ইতিহাসে একটি অত্যন্ত রূপান্তরকারী ঘটনা হিসাবে প্রমানিত হয়। এই ঘটনার পর ব্রিটিশরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে তাদের অধিপত্যে নিয়ে আসে। ভারতের পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে। এর সাথে সাথে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন হয়। অনেক পুরোনো জিনিস কালবাহ্য হয়ে যায়, এবং কিছু একপাশে রাখা হয়। একটি বড় পরিবর্তন হয়। ভারতীয় ইতিহাসে মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগের কালখন্ড প্রারম্ভ হয়।

অনুশিলনী

১. এক কথায় লেখো।

(১) যিনি ইন্দোরের রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ____________

(২) নাগপুরের ভোসলে ঘরানার সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও সক্ষম ব্যক্তি ____________

(৩) যিনি সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়েছিলেন ____________

(৪) যিনি দক্ষিনের রাজনীতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন ____________

২. কালক্রমানুসারে লেখো।

(১) আষ্টির যুদ্ধ।

(২) উড়িশার উপর মারাঠাদের আধিপত্য

(৩) ব্রিটিশরা পুনেতে ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করে।

৩. লেখন করো ।

(১) অহিল্যাবাই হোলকরের কাজ।

(২) মহাদজী শিন্দের পরাক্রম।

(৩) গুজরাটে মারাঠী সত্তা।

৪. মারাঠী সত্তা শেষ হওয়ার কারন আলোচনা করো।

উপক্রম

মারাঠা সত্তার বিস্তারের অবদান রাখে এমন পরিবারের জন্ম তথ্যের একটি সচিত্র সংগ্রহ তৈরী করো। এটি বিদ্যালয়ে একটি প্রদর্শনীতে রাখো।

শনিওয়ার বাড়া, পুনে

১৩. মহারাষ্ট্রের সামাজিক জীবন

ছত্রপতী শিবাজী মহারাজ দ্বারা স্থাপিত হিন্দবী স্বরাজ্য প্রজাদের রাজ্য ছিল। প্রজাদের কল্যান হোক জনগণের উপর অত্যাচার না হোক, মহারাষ্টে ধর্মের রক্ষা হোক, ইহা শিবাজী মহারাজের উদর নীতি ভাবনার উদ্দেশ্য ছিল। শিবাজী মহারাজের পরবর্তী কালখন্ডে ও মরাঠা রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ বিস্তার হয়েছে। মারাঠী শ।সন প্রায় ১৫০ বছর পর্যন্ত টিকে ছিলো।

মরাঠা রাজ্য শাসন ব্যবস্থার তথ্য আমরা পিছনের পাঠাংশে অধ্যয়ন করেছি। এই পাঠে আমরা তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি জনজীবন বিষয়ে তা অধ্যয়ন করব।

সামাজিক পরিস্থিতি : জমি ও জমির উপর নির্ভর ব্যবসা বাণিজ্য গ্রাম স্তরে ফসল উপাদনের প্রধান সাধন ছিলো। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি বা পাটিলের উপর গ্রামের রক্ষার দায়িত্ব ও গ্রামের কুলকর্ণী রাজস্ব দেখা সুণার দায়িত্ব পালন করতেন। পাটিলের কাজের জন্য পাটিলকে জাগিরদারী হিসেবে জমি দেওয়া হত। এই কাজের জন্য তিনি রাজস্বর কিছু অংশ পেত। বলুতেদার (ব্যবসায়িক) গ্রামের লোকের জন্য তাদের কাজের পরিশ্রামিক মূল্য বস্তু রূপে দেওয়া হত। গ্রামে পরিচালিত ব্যবসার দুটি প্রধান অংশ ছিল - কালো এবং সাদা। কালো অংশে কাজ করা ব্যক্তি কৃষক এবং সাদা অংশে কাজ করা ব্যক্তি সাদা শ্রমিক বা সাদা পেশা। গ্রামের সকল কার্যব্যবহার পারস্পরিক বোঝা-পড়ার উপর নির্ভর করে চলত। সংযক্ত পরিবারকে অধিক মহত্ব দেওয়া হত।

তুমি জানো কি ?

গ্রামে কামার, কাঠমিস্ত্রী, কুমোর (কুম্ভার) সোনারু অন্যান্য বারোটি ব্যবসাদার(বলুতেদার) ছিল। এই ব্যবসায়ীরা গ্রামের কাজ কর্ম করতেন।

রিতি-রিবাজ : এই সময় কালখন্ডে বাল্য-বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন ছিল। বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলন হয়েছিল। বিধবা স্ত্রীদের পুর্নবিবাহর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মানব দেহের উপর অন্তিম সংস্কার করার জন্য দাহন বা দফন করত এবং বিসর্জন করার পদ্ধতি প্রচলন ছিল। ছোট-ছোট কথার জন্য বা যুদ্ধের জন্য মহুর্ত দেখা হত। সপ্নে শুভ-অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস করত। দেব-দেবী অথবা গ্রহের প্রকোপ না হয়, তার জন্য যোগ্য অনুষ্টান করা হত।সেই জন্যে দান-ধর্ম করতো। জোতিষ বিদ্যার ওপর মানুষের বিশ্বাস ছিল। শাস্ত্রীয় দৃষ্টির অভাব, এবং ঔষধ উপচার করা অপেক্ষা দৈবী শক্তি বা ঝাড়া-পোছার মান্যতা বেশী ছিল।

জীবন-যাপন : বহু সংখ্যায় লোক গ্রামে বসবাস করতো। শুধু লবন অন্য স্থান থেকে আনা লাগতো। কর্তব্যদের আবশ্যক বস্তুর মর্যাদা ছিল। তাহারা জোয়ারী, বাজরা গম, নাচনী ভুট্টা, ধান ইত্যাদি ফলন ফলাতো। তাদের প্রতিদিনের খাদ্যে রুটি, পিয়াজ চাটনি এবং শুকনো খাবারে সমাবিষ্ট ছিলো। লোক নিজ-নিজ ব্যবসায়িক বস্তুর আদান-প্রদান পদ্ধতিতে করতেন। গ্রামের ঘরগুলি সাদা মাঠা ও মাটি বা ইট দ্বারা তৈরী করতো। শহর অঞ্চলে ঘর-বাড়ি একতালা বা দুই তালা ঘর ছিল। সম্পূর্ণ শ্রেণীর লোকের খাদ্যে ডাল-ভাত, রুটি তরকারী শাক-শব্জী, দুধ-দৈ ইত্যাদি খাদ্য ছিল। পরিধানে পুরুষ ধুতি-কুর্তা অঙ্গরক্ষা পাগুড়ী ধারন করতেন। লুগড়া (নয় গজের শাড়ী) এবং ব্লাউজ স্ত্রীদের পোশাখ ছিল।

উৎসব অনুষ্ঠান: গুট্টীপাড়বা, মনসাপুজ্য, গরুরপুজা, (পোলা), দসরা, দিপাবলী, মকর সংক্রাতী, হোলী, (দোল পুর্নিমা) ঈদ এইরুপ উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করতেন। পেশবার শাসন কালে গনেশ উৎসব খুব উৎসাহে সহিত পালন করতেন। তার স্বরুপ ঘরগুতি ছিল। পেশবাজী স্বমং গনেশ ভক্ত ছিলেন। এই জন্য গনেশউৎসব অতি মহত্ব পুর্ন স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক বৎসর ভাদ্রপত চতুর্থী থেকে অনন্ত চর্তুদশী পর্যন্ত এই উৎব চলতে থাকত। সাড়ে তিন শুভ এবং উত্তম মুহর্তের মধ্যে দশরা একটি শুভ মুহর্ত মানা হয়। লোক দশরার দিন থেকে

শুভকার্য শুরু করে। এই দিনে যন্ত্র-পাতি এবং গাড়ী, অস্ত্র সাধন সাহিত্যের পূজা করা হয়। অভিবাদন করে একে অপরকে সোনা-পাতা দেয়। দশরা শেষ হওয়ার পর মরাঠারা যুদ্ধ অভিযানে বেরিয়ে যায়। দীপাবলীর বলি প্রতিপদা (বলিদান) এবং ভাইফোটা (ভাইবীজ) বিশেষভাবে পালন করে থাকে। গাও- গ্রামে যাত্রা(মেলা) ভরে। মেলাতে কুস্তী লড়াই আড্ডার প্রদর্শন হয়। গুড়ীপাড়বা এই দিনে গুড়ী স্থাপন করে এই উৎসব পালন করা হয় । উৎসবের সময় নৃত্য গান, মনোরঞ্জাত্মক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। তামাশা(লোকনাটা) মনোরঞ্জনের একটি জনপ্রিয় প্রকার ছিল।

গরুর পোলা (গরুর পূজা)

শিক্ষা : এই কালখন্ডে শিক্ষা পদ্ধতি পাঠশালা এবং মদরসাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছিল। বাড়ীতে পড়া, লেখা, হিসাব-কিতাব রাখার শিক্ষা পেয়ে যেত। মোড়ী লিপির ব্যবহার আদন প্রদানের জন্য করা হত।

পরিবহন ভ্রমণ : ঘাটিমার্গ, রাস্তা, নদীর উপর পুল দ্বারা যাতায়ত চলত। অন্ন দ্রব্য, বস্ত্র, জিনিস-পত্রের আনা নেওয়া গরুর পিঠের উপরে করা হত। নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার ব্যবহার করত। চিঠি পত্র আনা নেওয়ার কার্য সান্তনী সওয়ার অথবা দূত বা হরকরা এরা করত।

খেলা-ধূলা : এই সময়কালে বিভিন্ন খেলা-ধূলা করা হত। খেলা একটি মনোরঞ্জনের সাধন ছিল। কুস্তি এবং যুদ্ধ কৌশল খেলা খুব জনপ্রিয় ছিল। মল্লখাম্বা (মলন খুটি) দন্ড, কুস্তি, লাঠি চালানো লাটি পাট্টা, খেলা খেলত। হুতুতু (কবাড্ডী) খো-খো আটিয়া পাট্টা হল বহিরংগন খেলা, তবে সোংগাতা,গাঞ্জিফা দাবা খেলা বৈঠক খেলা খুব জনপ্রিয় ছিল।

মল্লখাম্বা

ধর্ম ও আচার-বিচার (ধর্ম নৈতিকতা) : হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি প্রদান ধর্ম। এই সময়কালে দেখা যায়। ছত্রপতী শিবাজী মহারাজের ধার্মিক নীতি উদর ভাবনা ছিলো। প্রত্যেকে নিজ-নিজ ধর্মনুসার ব্যবহার করবে। অন্যের উপর নিজ ধর্মের শক্তি দেখাবে না। এই রুপ (বিচার করা) চিন্তা ধারা ওই সময়কালে প্রচলিত ছিল। শাসন দ্বারা পাঠশালা মন্দির মদরসা এবং মসজিদের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত। দুটি ধর্মের অনুসার একে-অপরে উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন । বারকরী মহানুভাব, দত্ত, নাথ, রামদাসী এই পন্থ প্রচলিত ছিল।

মহিলাদের জীবন : এই সময়ে মহিলাদের জীবন খুব কষ্টময় ছিল । মায়ের ঘর এবং শশুর বাড়ী তাদের একমাত্র পৃথিবী ছিল। তাদের লেখা-পড়ার জন্য কেউ লক্ষ্য দিত না। ব্যতিক্রমে নারীরা অক্ষর পরিচয়, প্রশাসন এবং যুদ্ধ কুশলতায় উন্নতি করেছিল। এর মধ্যে বীর মাতা জীজাবাই, এসুবাই, মহারানী-তারাবাই, উমাবাই দাভাড়ে, গোপিকাবাই, পুণ্যশ্লোক, অহিল্লবাই, এনাদের নাম উল্লেখযোগ্য ছিল। বাল্যবিবাহ, বিষম বিবাহ, বিধবা, কেশবিন্যাস, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বহুবধু যেমন কুপ্রথার জন্য নারীদের জীবন অত্যন্ত দুস্করময় ও দুখময় হয়ে উঠেছিল। একত্রিত মহিলাদের জীবন খুব প্রতিকূল ছিল।

ইংরাজী ১৬৩০ থেকে ১৮১০ অর্থাৎ পৌনে দুইশ বৎসরের কালখন্ডের সময়কে সাধারণত মারাঠাশাহী বলা হয়। এই কাল খন্ডের শিল্পকলা স্থাপত্যের আমরা সংক্ষেপে সমীক্ষন করব।

শিল্পকলা: শিবাজী মহারাজের আমলে কসবা গণপতী মন্দির নির্মাণ, লালমহলের নির্মিতী রাজগড় এবং রায়গড়ের নির্মাণ কার্য, জলদূর্গের নির্মাণ, এই রূপ স্থাপত্য নির্মানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় হিরোজী ইন্দুলকর বিখ্যাত স্থাপতী বিশারত ছিলেন।

সম্ভবত গ্রাম বসানোর সময় একে অন্যকে সমকোন কাটে ওইরুপ রাস্তা, রাস্তার পাশে পাথর লাগানো, নদীর তীরে ঘাট নির্মানের সংরচোনা করতেন পেশবা কালখন্ডে আহ্মদনগর, বিজাপুরের মতো পানীয় জলের ব্যবস্থা পুনে শহরে করেছিলেন। পেশবা ভূমিগত নল, ছোট-ছোট বাঁধ বাগ বাগিচা, জলের ফোয়ারা নির্মাণ করেছিলেন। পুনে শহরের নিকটে হড়পসর স্থানে দিবে ঘাট নির্মাণ করে মস্তানী তালাব স্থাপনার দৃষ্টিতে মহত্বপর্ণ ছিল।

পুনের শনিবারবাড়া বিশ্রামবাড়া, নাশিকের সরকার বাড়া, কোপরগাওতে রঘুনাম পেশবায়ের বাড়া (মহল) সাতারকর ছত্রপতীর বাড়া (মহল) এর ব্যতিরিক বাই মেনবোলী চোকে, শ্রীগোন্দ পন্ডরপূরের পুরাতন মহল, মধ্যযুগের মহল বা রাজবাড়ী একটি সাংস্কৃতিক চিহ্ন ছিল।

মহলের নির্মাণ কার্যে কাঁচা এবং পাকা ইটের ব্যবহার করেছিল। কাঠের খুটি (স্তম্ব) পাথরের খিলান, উকৃষ্ট ঘোটা চুন, কবেলুর ছাদ, মাটি, বাঁশ এর ব্যবহার নির্মাণ কার্যে করেছিল। মহলের সাজ সজ্জার জন্য চিত্রকলা, রঙ্গীনকার্য, কাষ্ঠশিল্প আয়না (দর্পন) ব্যবহার করতেন।

মন্দির : শিবাজী মহারাজের আমলের মন্দিরগুলি, যাদব আমলের হেমন্তপন্তী শৈলীর ছিল। কোলাহপুর অম্বাবাই মন্দিরের চুড়া, জ্যোতিবা পাহাড়ের মন্দির, শিখর শিংনাপুরের শম্ভুমহাদেব, বেরুলের গনেশ্বর মন্দির, শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রতাপগড়ে মা ভবানী দেবীর ও গোওয়াতে সপ্তকোটেশ্বরের মন্দির শিবাজী মহারাজ নির্মাণ করেছিলেন । পেশবা আমলে নাশিকে কালারাম মন্দির ত্রেম্বকেশ্বরের শিবমন্দির, গোদাবরী প্রবারা নদীর সঙ্গম (মিলনস্থানে) স্থানে স্থিত কায়গাও টোকের শিবমন্দির, নেবাসার, মোহিনীরাজ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

ঘৃনেশ্বর মন্দির

ঘাট: নদী বা নদীর সঙ্গম স্থলে আকার দেওয়া পাথর দ্বারা তৈরী করা ঘাট মারাঠাশাহীর বিশেষতা পাওয়া যায়। এই সময়কালে সর্ব সুন্দর ঘাট গোদাবরী এবং প্রবরা নদীর সঙ্গম স্থানে উপরে প্রবর সঙ্গম এবং টোকে তৈরী করেছে। পাকা বা শক্ত তৈরী সিড়ির পংত্তিতে সঠিক অন্তরে দিত্বীয় সিড়ি সামনে তৈরী করেছিলেন। এই কারণে সকল ঘাটের সৌন্দর্য বেড়ে উঠেছিল। জলের স্রোতে যেন ঘাটের স্খলন না হয়, তার জন্য সঠিক দূরত্বে শক্ত টাওয়ার বা বুর্জ বাধত।

চিত্রকলা : পেশওয়ার কালখন্ডে শনিবার বাড়া মহলের দেওয়ালে খুব মহত্বপূর্ণ চিত্র রয়েছে। এই সময়ে রাঘো, তানাজী, অনুপরাও, শিবরাম, মানকোজী এনারা খুব বিখ্যাত চিত্রকার ছিলেন সওয়াই মাধবরাও পেশবার কার্যকালে গঙ্গারাম তাম্বট বিখ্যাত চিত্রকর ছিল। পেশবাজী চিত্রকলাকে প্রেরনা জাগিয়েছেন। পেশবার কার্যকালে

পুনে, সাতারা, মেনবলী, নাশিক, চান্দবাড় এবং নিপানী এই অঞ্চলের রাজ বাড়ীর মধ্যে দেওয়ালে চিত্র ছিল। পান্ডেশ্বর মোরগাও পাল, বেনবড়ী, পূনার নিকটে পাষান এই স্থানে মন্দিরের দেওয়ালে চিত্র ছিল। এই কালের চিত্রের বিষয় অর্থ দশাবতার গনেশজী, শঙ্কর রামপঞ্চায়তন, বিদর্ভের জামোদে নির্মিত জৈন মন্দিরে জৈন চরিত্র এবং পৌরানিক কথা অঙ্কিত করা হয়েছে। এই রকম রামায়ন, মহাভারত, উৎস অনুষ্ঠান পার্বন উপর ভিত্তি করে চিত্র তৈরী করে ছিল। পুঁথি, বহুগুলিতে চিত্র। ছবি লঘুচিত্র ব্যাক্তিচিত্র, ঘটনাগত ছবিও ছিল।

শিল্প (ভাস্কর্ষ) : শিবকালিন সময়ে শিবাজী মহারাজ কর্ণাটক আক্রমন সময়ে মলমা দেসৌহয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার চিত্র, শিল্প ভুলেশ্বর মন্দিরের উপর শিল্পকায, ব্যক্তি শিল্প, প্রাণীর শিল্প (উদা. হাতী, ময়ুর, বানর) টোকে এখানের মন্দিরের শিল্প ও বাইরের ভাগের শিল্পকার্য, পুনের। ত্রিশুন্ড গনেশ মন্দির, মধ্য প্রদেশের অহিল্যা দেবী। হোলকরের ছাতা, নেবাসের মেহিনীরাজ মন্দিরের শিল্পকলা মহত্বপূর্ণ ছিল।

ধাতুর মূর্তি (প্রতিমা) : পেশবাজী পূনের পর্বতী এখানের মন্দিরের পার্বতী ও গনেশর মূর্তী পূজার জন্য তৈরী করে নিয়েছিলেন তদরুপ কাষ্ঠশিল্প ও নির্মিতী করিয়ে ছিলেন।

বাঙ্ময় (গ্রন্থ সাহিত্য) : সন্ত সাহিত্য, পৌরনিক শাস্ত্র (কাহীনী) ভাষ্য কবিতা, ওভি, অভঙ্গ গ্রন্থ গল্প জীবনী, সাধুদের চরিত্র, স্পষ্ট কবিতারচনা, দেবদেবীর প্রসঙ্গে প্রার্থনা, পোবাড়ে বাখারি ঐতিহাসিক চিঠী-পত্র সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

নাট্যকলা : সাতারোবা শতাব্দীর শেষে দক্ষিণে তঞ্জোর নামক স্থানে মরাঠী নাটকের প্রারম্ভ হয়েছিল। সরফোজী রাজারা এই কলাগুনকে প্রেরনা ও প্রতসাহিত করেছিলেন। এই নাটকে গায়ন এবং নৃত্যকে মহত্বপূর্ন স্থানে দিয়েছিল।

এই পর্যন্ত আমরা মধ্যযুগের অধ্যয়ন করেছি। মরাঠী শক্তির উদয় এবং বিস্তার নিয়ে অধ্যয়ন করেছি। আগামি বছর আমরা আধুনিক যুগের অধ্যয়ন করব।

অনুশীলনী

১. ছকটি পূর্ণ করো।

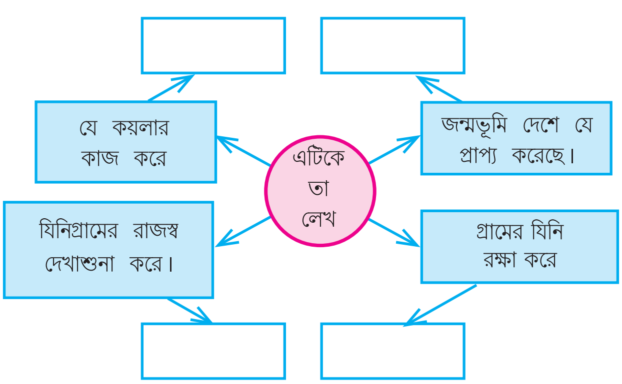

২. সমাজে প্রচলিত কুপ্রথাগুলি কি, কি? এগুলো দুর করার জন্য সমাধানের পরামর্শ দাও।

৩. তোমার পরিবেশে কোন-কোন উৎসব উদযাপন করা হয়, এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত টিপ্পনী (নোট) লেখ।

৪. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে শিবযুগের সামাজিক জীবন ও বর্তমান সামাজিক জীবন এর তুলনা করো।

অনু ক্র.	বিষয়	শিবযুগের সামাজিক জীবন	বর্তমানের সামাজিক জীবন
১.	ব্যবহার	....	....
২.	ঘর	....	পাকা ইট, সিমেন্ট দ্বারা নির্মিতী কাংক্রীটের অনেক তালা ঘর।
৩.	যাতায়ত	....	বাস, রেল, বিমান (উড়ো জাহাজ)
৪.	মনোরঞ্জন	....	....
৫.	লিপি	....	....

উপক্রম

আমাদের দেশের সক্ষম নারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো। তাহা শ্রেণীতে পড়। যেমন পি. বী. সিন্ধু, সাক্ষী, মলিক

নাগরিক শাস্ত্র

- অনুক্রমনিকা -

আমাদের সংবিধান

ক্রমাঙ্ক	পাঠের নাম	পৃষ্ঠ ক্র.
১.	আমাদের সংবিধানের পরিচয়	৬৩
২.	সংবিধানের উদ্দেশিকা..	৬৮
৩.	সংবিধানের বৈশিষ্ট্য	৭২
৪.	মৌলিক অধিকার ভাগ-I...	৭৬
৫.	মৌলিক অধিকার ভাগ II	৮০
৬.	নীতি নির্দেশমূলক সিদ্ধান্ত .... এবং মৌলিক কর্তব্য	৮৩

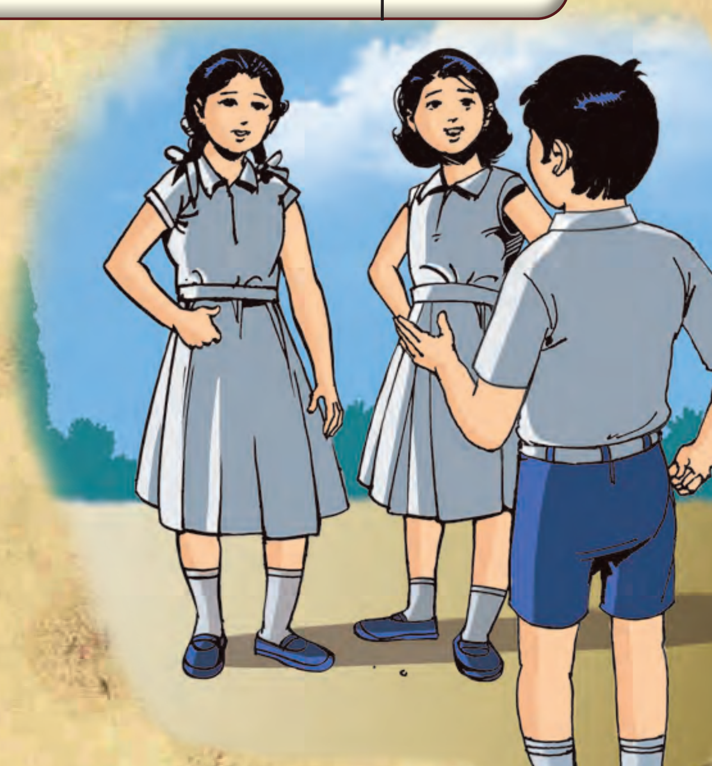

অধ্যয়ন নিষ্পত্তি

নির্দেশিত শিক্ষাগত প্রক্রিয়া	অধ্যয়ন নিষ্পত্তি
অধ্যয়নার্থীদিগকে অধ্যয়ন অনুভবের সুযোগ প্রদান করে উপযুক্ত সমুহে এখজন বা দুজন ব্যক্তিগতভাবে নিম্ন কার্যের জন্য উৎসাহিত করাবেন। • গনতন্ত্র, সমতা, রাজ্য শাসন, লিঙ্গভেদ, মিডিয়া, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি মত সংকল্পনার (ধারনার) উপর আলোচনায় সহভাগী হওয়া। • সংবিধানের গুরুত্ব উদ্দেশ্য সমতার অধিকার, সমতার লড়াইএর উপর চিত্র, (ছবি) ছবি সংগ্রহ করে এর সাহায়ে ভিত্তিপত্রক (পোষ্টর) তৈরী করা। • সংবিধানের বৈশিষ্ট তথ্য প্রাপ্ত করবে। • মৌলিক অধিকার বিষয়ে আলোচনা করবে। • গনতগ্রে সমতা, মেয়েদের সঙ্গে ভেদাভেদ (বৈষম্য) ইত্যাদি বিষয়ে গান, কবিতার সাথে ভূমিকা পালনের প্রস্তুতীকরন করা। • নির্দেশিত তত্ত্ব এবং মৌলিক কর্তব্য। সমানতা-অসমানতা বিষয়ে আলোচনা করা।	**ছাত্র-ছাত্রী-** 07.73H.13 গনতন্ত্রের সমানতার মহত্বপূর্ণ বিশেষতা বুঝতে পারে। 07.73H.14 রাজ নৈতিক সমানতা, অর্থনৈতিক সমানতা এবং সামাজিক সমানতারমধ্যে তক্ষাৎ বুঝতে পারে। 07.73H.15 সমতার অধিকার বিষয়ে আমাদের অঞ্চলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করে। 07.73H.16 স্থানীয় সরকার (শাসন) এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। 07.73H.17 গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্টগুলি ব্যাখ্যা করে। 07.73H.18 সংবিধানে উল্লেখিত করা অধিকার আদালতের বিশেষ সুরক্ষা রয়েছে ইহা বুঝে নেয়। 07.73H.19 আইনের সামনে সকল ব্যক্তি সমান এটা বুঝতে পারে। 07.73H.20 নির্দেশিত তত্ত্বগুলিকে আদালতের সুরক্ষা থাকে না কিন্তু এটা শাসনের উপর বাধ্যতামূলক ইহা বুঝতে পারে 07.73H.21 মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক কর্তব্য উপযুক্ত উদাহরনের সাহায্যে বলতে পারে। 07.73H.22 মৌলিক অধিকার সমন্ধে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে অধিকার লঙ্ঘন, অধিকার- সুরক্ষা এবং অধিকারের পালন কিভাবে করা যেতে পারে ইহা বুঝতে পারে।

১. আমাদের সংবিধানের পরিচয়

চলো, একটু পূনরাবৃত্তি করি!

গত শ্রেনীতে নাগরিক শাস্ত্রে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে আমরা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক বিষয়ে বুঝতে পেরেছি। পরিবার, পাঠশালা, আমার গ্রাম অথবা শহর এর ব্যবহার সুচারুভাবে চলবে সেজন্য লক্ষন এবং নিয়মগুলি পালন করি। পরিবারের সদস্যগন কেমন আচারন করবে, এই বিষয়ে কিছু নিয়ম রয়েছে। পাঠশালায় প্রবেশ সম্বন্ধে, ইউনিফার্ম এবং পড়া শোনার নিয়ম রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতার নিয়ম রয়েছে। আমাদের গ্রাম এবং শহরের ব্যবস্থা নিয়মনুসার প্রচালিত হয়। একইভাবে আমাদের দেশ নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়। পরিবার, পাঠশালা, গ্রাম, বা শহর সমন্ধে নিয়মগুলি সীমিত স্বরুপের থাকে, কিন্তু দেশের ব্যবস্থা সমন্ধে পরিচালনার নিয়ম বা বিধান বিস্তৃত (ব্যপক দৃষ্টিকোন) হয়।

সমির এবং বন্দনার মনে যে প্রশ্ন উদভাসিত হয়েছে, তুমি ও কি ওই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাও?

- দেশের শাসনব্যবস্থা যে নিয়মে বা নিয়ম নির্ধারননুসার পরিচালনা হয়, ওই নিয়ম কোথায় নির্দেশিত করা হয়?
- এই নিয়মগুলি কে তৈরী করে? তাহার পালন করা বাধ্যতামূলক হয় কি?

নীচের পাঠাংশে (পরিছেদ) উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে কি? দেখো।

সংবিধান: অর্থ

দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা সমন্ধে যে নিয়ম আইন প্রাবধান রয়েছে, এবং সুসূত্রভাবে যে গ্রন্থে বা পুস্তকে উল্লেখিত করা হয়েছে, তাহাকে সংবিধান বলা হয়। এর অর্থ সংবিধান দেশের রাজদরবার প্রশাসন আইন ব্যবস্থার লিখিত পুস্তক। প্রজা বা জনতা দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিধি সরকার গঠন করে। সংবিধানের নিয়মনুসারে প্রশাসন পরিচালনা করা শাসনের অনিবার্য হয়। সংবিধানের বিধাননুযায়ী সরকার সাশর করতে বাধ্য। সংবিধানে বিধান বা এতে উল্লেখিত আইন মৌলিক হলে ও সংবিধানের সঙ্গে অসম্বাতিপূর্ণ আইন শাসন করতে পারবে না। এরুপ করলে আইন ন্যায়মন্ডল বাতিল করতে পারে।

সংবিধানের বিধানগুলি

সংবিধানের বিধানগুলি বহুবিদ বিষয়ে হয়ে যাবে যেমন, নাগরিকত্ব, নাগরিকের অধিক অধিকার নাগরিক এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কে। শাসন দ্বারা নির্দেশিত আইনের বিষয়, নির্বাচন, শাসনের সিমা এবং রাজ্য শাসনের অধিকার ক্ষেত্র ইত্যাদি।

সংবিধান অনুযায়ী শাসনের নীতি প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত্রি দিয়েছে। কিন্তু এরুপ হওয়া সত্বেও প্রত্যেক দেশের সংবিধানের রুপরেখা ভিন্ন-ভিন্ন থাকে। দেশের ইতিহাস, সামাজিক রচনা, সংস্কৃতি, বংশানুবংশ ইত্যাদি সমন্ধে দেশেরমধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। একই ভাবে দেশের আবশকতা ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে সেই অনুসার এমন সংবিধান নির্মাণ করার প্রচেষ্ঠা অন্য দেশ করে থাকে।

তুমি জানো কি ?

অমেরিকা, ইংলেন্ড এই দেশের শাসন ব্যবস্থা সংবিধাননুসার পরিচালনা হয়। কিন্তু উভয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন অমেরিকার সংবিধান ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আমলে এনেছে। এটি লিখিত তাহাতে শুধুমাত্র ৭টি ধারা (কলম) সমাবেশ রয়েছে। কিন্তু ২২৫ বছরের থেকে বেশি সময় পরেও ওই সংবিধাননুসারে বর্তমান অমেরিকার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে।

ইংলেন্ড দেশে বহু শতাব্দীর ইতিহাস রয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থা সমন্ধে নিয়ম এই দেশের সংকেত ঐতিহ্য পরম্পরা স্বরুপে পাওয়া যায়। তবু ও এই আইনের কঠোরভাবে পালন করে থাকে। ইংলেন্ডের সংবিধান ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগনাকার্টা চুক্তি (সন্ধি) থেকে বিকাশিত হয়েছিলো। কিছু লিখিত নিয়মের সমাবেশ ছিল তবু ও ইংলেন্ডের সংবিধান মূলত অলিখিত ছিল।

চলো খোঁজ করি!

তোমার পছন্দমত যে কোনো একটি দেশের সংবিধান বিষয়ে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করে সংক্ষেপে তথ্য প্রাপ্ত করো।

দেশের নাম, সংবিধান নির্মিতী বৎসর, সংবিধানের দুটি বৈশিষ্ট।

সংবিধানের প্রয়োজন : সংবিধানে উল্লেখিত নিয়ম বা বিধান অনুসার প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার অনেক লাভ পাওয়া যায়।

- প্রশাসনের নিয়মে থেকে শাসন ব্যবস্থা করা উচিৎ। ওই জন্য তাদের প্রাপ্ত অধিকার বা ক্ষমতার অপব্যবহারে সম্ভাবনা কম থাকে।
- সংবিধানে নাগরিকের অধিকার ও তাদের স্বাধীনতা উল্লেখ করা হয়েছে। ওই অধিকার প্রশাসন কেড়ে নিতে পারে না তাই নাগরিকের অধিকার ও স্বাধিনতা সুরক্ষিত থাকে।
- সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শাসন করার অর্থ আইনের বা নিয়মবদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। কারণ ক্ষমতার অপব্যবহার বা স্বেচ্ছাচারিতার প্রশাসনের অবকাশ নেই।
- সংবিধান অনুযয়ী শাসনব্যবস্থা কাজ করছে দেখে, শাসনের প্রতি সাধারন মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য তারা অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সাধারন মানুষের অংশগ্রহণে বৃদ্ধি হওয়ার জন্য গনতন্ত্র অধিক সশক্ত হয়ে ওঠে।
- সংবিধান নিজ-নিজ দেশের সম্মুখে রাজনৈতিক আদর্শ প্রস্তাবিত করে। সংবিধানের নিয়ম অনুসার দেশ পরিচালন। করা বাধ্যতামূলক হয়। এর দ্বারা বিশ্বশান্তি এবং সুরক্ষা ও মানবীয় অধিকারের সুরক্ষার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়।
- সংবিধানে নাগরিকের দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত উল্লেখ থাকার জন্য নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিশ্চিত হয়।

প্রশাসনব্যবস্থার অর্থ কি?

দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার কোন-বিষয়গুলি সমাবেশ থাকে?

দেশের সীমারক্ষা বিদেশী আক্রমন থেকে জনগনের রক্ষা করা থেকে নিয়ে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান নির্মান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবা, শিল্প বানিজ্য প্রেরনা দেওয়া, দুর্বলজনঘটকের সুরক্ষা, মহিলা, শিশু ও আদিবাসিদের উন্নতীর জন্য উপায় পরিকল্পনা যেমন আগোনা বিষয়ের উপর প্রশাসনের আইন তৈরী করা লাগে। আইনের কার্যপ্রণালী দ্বারা সমাজে আবশ্যক পরিবর্তন করা হয়। সংক্ষেপে বলতে কি, আধুনিক সময়ে শাসনকে অন্তরিক্ষ্য (মহাকাশে) অনুসন্ধান থেকে সার্বজনিক স্বচ্ছতা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে নির্ণয় নেওয়া লাগে। ইহাকে প্রশাসন ব্যবস্থা বলা হয়।

সংবিধানের অর্থ এবং আবশ্যকতা বুঝে নেওয়ার পর এখন আমরা ভারতের সংবিধান কি ভাবে তৈরী হয়েছে, এটি দেখব।

সংবিধান নির্মিতীর পার্শ্বভূমিকা : ভারতের সংবিধান নির্মিতী ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের প্রশাসন ব্রিটিশদের প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত হবে না বরং ভারতের দ্বারা প্রণীত আইন অনুসারে পরিচালনা করা হবে। এরুপ স্বাধীনতা আন্দোলনের (মিছিল) নেতারা আগ্রহী ছিলেন। ফলস্বরুপ ভারতের সংবিধান তৈরী করার জন্য। একটি সমিতী স্থাপনা করা হয়েছিল। এই সমিতীকে 'সংবিধান সভা' (গনপরিষদ) নামে জানা হয়।

সংবিধান সভা (গনপরিষদ) : আমাদের দেশ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়েছিল। তৎপূর্বে

ডাঁ. রাজেন্দ্র প্রসাদ

ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজ্য ছিল। ইংরেজ শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য মুম্বই প্রান্ত, বাংলা প্রান্ত মদ্রাস প্রান্ত এই প্রান্তের প্রশাসন ওখানের জনপ্রতিনিধী দ্বারা পরিচালনা করা হয়। এই রুপ দেশের কিছু অংশে স্থানীয় রাজাদের দ্বারা প্রশাসন পরিচালনা করা হতো। এই ধরনের ক্ষেত্রকে সংস্থা (প্রতিষ্ঠান) বলা হয়। এবং ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে প্রতিষ্ঠান প্রমুখ বলা হয়। সংবিধান সভায় প্রান্ত এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধীর সমাবেশ ছিল।

সংবিধান সভায় মোট ২৯৯ জন সদস্য ছিলেন। ডাঁ. রাজেন্দ্র প্রসাদ সংবিধান সভার অধ্যক্ষ ছিলেন।

ডাঁ.বাবাসাহেব আম্বেডকরের যোগদান:

ডাঁ. বাবাসাহেব আম্বেডকর ড্রাফটিং সমিতীর

ডাঁ. জবাসাহেব আম্বেডকর

অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যন) ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশের সংবিধানের গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি দিনরাত অধ্যয়ন ও চিন্তাভাবনা করে সংবিধান প্রনয়ন করেছিলেন। ডাঁ. বাবাসাহেব আম্বেডকর কর্তৃক প্রনীত খসড়া সংবিধান পরিষদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

এটি দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। বেশকিছু সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। খসড়া সংবিধান গনপরিষদে উপস্থাপন, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তদরুপ সংবিধান সভার নির্দেশানুসার মুল খসড়া সংবিধান পরিবর্তন করা প্রতিটি বিধান নির্ভুল করারকাজ ডাঁ.বাবাসাহেব আম্বেডকর করেছেন। ভারতের সংবিধানে প্রনয়ন অবদানের কারনে তাকে ‘ভারতীয় সংবিধানের ভাস্কর’ বলা হয়।

সম্পূর্ণ সংবিধান লিখে পূর্ণ হওয়ার পর সংবিধান সভায় (গনপরিষদে) তাহা মান্যতা প্রদান করেছে। এবং ২৬ নোভেম্বর ১৯৪৯ সালে স্বীকৃতি পেয়েছে অথএব ২৬ নভেম্বর দিবস ‘সংবিধান দিবস’ রুপে পালন করা হয়। ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ থেকে সংবিধানের বিধাননুসার।

এটা কত গর্বের বিষয় ছিল!

- সংবিধান সভায় আলোচনা ও সমালোচনা ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিপরীত বা ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের সঠিক পরামর্শ স্বীকার করা ছিল কাজের বৈশিষ্ট।
- সংবিধান লিখে পূর্নকরার জন্য ২ বৎসর ১১ মাস এবং ১৭ দিন সময় লেগেছিল।
- মূল সংবিধানে ২২ টি খন্ড (অংশ) ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৮টি পরিশিষ্ট এর সমাবেশ ছিল।

তুমি জানো কি ?

গনপরিষদে সংবিধান সভায় ডাঁ. রাজেন্দ্র প্রসাদ, পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু, ডাঁ. বাবাসাহেব আম্বেডকর সরদার বল্লভভাই পটেল, মৌলানা আবদুলকলাম, আঝাদ, সরোজিনী নায়ডু, জে.বী. কৃপলানী, রাজকুমারী অমৃত কৌর, দুর্গাবাই দেশমুখ, হংসাবেন মেহতা এরুপ বহু মান্যবর সদস্য ছিল। বী.এন. রাও নামে একজন আই জীবিকে সংবিধান সভার আইন উপদেষ্টা মার্গদর্শক রুপে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা শুরু হয়ে গেল। এই দিন থেকে ভারতবর্ষে গনতন্ত্র রাজ্য অস্তিত্বে এসেছিল।

তার কারনে ২৬ জানুয়ারী এই দিবস আমরা ‘প্রজাসত্তাক দিবস’ হিসাবে পালন করে থাকি।

পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু

সরদার বল্লবভাই পটেল

মৌলানা আঝাদ

সরোজিনী নায়ডু

করে দেখো।

তোমাদের শ্রেণীর প্রশাসন নিয়মনুসার চালনা হোক এমন লাগে কি? তার মধ্যে তুমি কোন নিয়ম সমাবেশ করবে? তাহলে চলো শ্রেণীর জন্য একটি নিয়ম তালিকা তৈরী করো।

তুমি জানো কি ?

ডাঁ. বাবাসাহেব আম্বেডকরের যোগদান জল ব্যবস্থাপন, পররাষ্ট্র সমন্ধ, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, পত্রকারিতা, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ন্যায় এরুপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিলো।

ভারতের সংবিধানের খসড়া সংবিধান সভার অধ্যক্ষ
ডাঁ. রাজেন্দ্র প্রসাদ এনাকে প্রস্তুত করতে উপস্থাপন ডাঁ. বাবাসাহেব আম্বেডকর।

অনুশীলনী

১. নীচের ধারনাগুলো ব্যাখ্যা করো :

(১) সংবিধানের বিধান
(২) সংবিধান দিবস

২. আলোচনা করো।

(১) সংবিধান সমিতী স্থাপনা করা হয়েছে।
(২) ডাঁ. বাবাসাহেব আম্বেডকরকে 'ভারতের সংবিধানের ভাস্কর বা শিল্পকার বলা হয়'।
(৩) দেশের শাসন ব্যবস্থায় সমাবিষ্ট থাকা বিষয়।

৩. সঠিক উত্তর বেছে নাও।

(১) কোন দেশের সংবিধান সম্পূর্ন লেখা হয় নাই?
(অ) অমেরিকা (ব) ভারত
(ক) ইংলেন্ড (ড) এর মধ্যে নেই!

(২) সংবিধান সভার অধ্যক্ষ কে ছিলেন?
(অ) ডাঁ. বাবাসাহেব আম্বেডকর
(ব) ডাঁ. রাজেন্দ্র প্রসাদ
(ক) দুর্গাবাই দেশমুখ
(ড) বী. এন. রাও

(৩) নীচে দেওয়া সংবিধানে কে সভার সদস্য ছিলেন না?
(অ) মহাত্মা গান্ধী
(ব) মৌলানা আঝাদ
(ক) রাজকুমারী অমৃত কৌর
(ড) হংসাবেন মেহতা

(৪) মসুদা (খসড়া) সমিতির অধ্যক্ষ কে ছিলেন?
(অ) ডাঁ. রাজেন্দ্র প্রসাদ
(ব) সরদার বল্লভভাই পটেল
(ক) ডাঁ. বাবাসাহেব অম্বেডকর
(ড) জে.বী. কৃপলানি

৪. তোমার মতামত লেখো।

(১) শাসনকে কোন-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে হয়?
(২) ২৬ জানুয়ারী এই দিবস আমরা প্রজাসত্তাক দিবস হিসেবে কেন প।লন করি?
(৩) সংবিধানের বিধাননুযায়ী রাজ্য ব্যবস্থা করার সুবিধা।

উপক্রম

(১) সংবিধান সভার জন্য বিবিধ সামিতীর স্থাপনা হয়েছে। তাহার বিষয়ে তথ্য জেনে নাও। ও সমিতীর নামের তালিকা তৈরী করো। এবং নামসহিত ছবি সংগ্রহ করো।
(২) 'সংবিধান দিবস' বিদ্যালয়ে কিভাবে পালন করা হয়েছে তার একটি অহবাল (প্রতিবেদন) তৈরী করো।
(৩) সংবিধান সভার সদস্যদের ছবি সংগহ করো।

২. সংবিধানের উদ্দেশিকা

পিছনের পাঠে আমরা কি শিখেছি :

- সংবিধান আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র, যে নিয়মে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়।
- ভারতের সংবিধানের নির্মিতী সংবিধান সমিতী সভা দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে।
- আমাদের জনপ্রতিনিধী সংবিধানের আইননুসার দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করা হয়।

সংবিধান এটি আমাদের দেশের মৌলিক এবং সর্বশেষ্ঠ আইন ব্যবস্থা। কোনো আইন করার জন্য কিছু নিশ্চিত উদ্দিষ্ট বা হেতু থাকে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার পর অন্যান্য বিধান গুলি বিস্তারিত ভাবে তৈরী করা হয়। তা একত্রভাবে সংক্ষেপে ও সু-সংগত পদ্ধতীতে রচনা করাকে সংবিধানের উদ্দেশ্য বলা হয়। উদ্দেশিকা, ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা বা সরনামা বলা হয়। উদ্দেশিকা আমাদের সংবিধানের উদ্দেশ্য ব্যখ্যা স্পষ্ট করে।

করে দেখো।

সংবিধানের উদ্দেশিকা পড়। তা থেকে শব্দ তালিকা তৈরী করো। এই শব্দগুলি তুমি অন্য কোথায় পড়েছ?

আমরা সকলে ভারতের নাগরিক। আমাদের সকলকে একটি দেশরুপে কি অর্জন করতে চাই ইহা উদ্দেশিকা নির্দেশ করে। এর মধ্যে মূল্যবোধ চিন্তা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য মহত্বপূর্ণ। সেগুলি কিভাবে পেতে হবে এই বিষয়ে বিধানগুলি সম্পূর্ণ সংবিধানে স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংবিধানের উদ্দেশিকা শুরুতে আমরা ভারতের জনগণ এই শব্দ দ্বারা হয়। ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতন্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক গণরাজ্য নির্মাণ করার ভারতের সংকল্প বর্ণনা করেছে। এর প্রত্যেক পদগুলির অর্থ বুঝে নেবে।

(১) সার্বভৌম রাজ্য : ভারতবর্ষে দির্ঘসময় ধরে ব্রিটিশের রাজ্য ছিল। ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভারত সার্বভৌমত্ব লাভ করেছে। আমরা আমাদের দেশে সঠিক দিশায় নির্ণয় নেওয়ার স্বাধীনতা পেলাম কোনো একটি দেশ বিদেশী নিয়ন্ত্রনে থাকে না, নিজেদের প্রভুত্ব স্বীকার করে তাকে সার্বভৌম রাজ্য বলা হয়।

আমাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংগ্রামের সব থেকে গুরুত্ব পূর্ণ উদ্দিষ্ট সার্বভৌমত্ব প্রাপ্ত করা। সার্বভৌমত্ব কথার অর্থ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার পাওয়া গনতান্ত্রিক দেশে সার্বভৌমত্ব ইহা জনগনের হাতে থাকে জনগন নিজেদের প্রতিনিধী নির্বাচন করে দেওয়ার অধিকার তাদের সার্বভৌম ব্যবহার কবার অনুমতী দেয়। আমাদের দেশের অন্তর্গত আমরা কি নিয়ম, আইন তৈরী করব ইহা নির্ধারন করার অধিকার জনতা এবং জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকারের হাতে অধিকার থাকে।

(২) সমাজতান্ত্রিক রাজ্য : সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে ধনী-গরীবের মধ্যে কোনো বড় ব্যবধান নেই। দেশের সম্পত্তির উপর সকলের অধিকার থাকে। সম্পত্তির কেন্দ্রীভবন কিছু লোকের হাতে না যায়। এর প্রতি দক্ষতা নেওয়া হয়ে থাকে।

(৩) ধর্মনিরপেক্ষ রজ্য : উদ্দেশিকায় ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের উদ্দিষ্ট বলা হয়েছে। ধর্মনিরাপেক্ষ রাজ্যে সকল ধর্মের জনগনকে সমান আদর সম্মান দেওয়া হয়েছে।

কোনো একটি ধর্মকে রাজ্যের ধর্ম মান্যতা দেওয়া হয় না। নাগরিকদের নিজ ধর্ম পালন করার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। নাগরিকের মধ্যে ধর্মের ভিত্তি করে ভেদাভেদ করা যাবে না।

তুমি জানো কি ?

আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে আমাদের সমাজের বহু-ধর্ম রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আমাদের সংবিধানে বর্ণিত অনেক অধিকার দিয়েছে, তাহা আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করা যাবে না। ধর্মের স্বাধীনতা ও তদরুপ আমরা যখন উৎসব অনুষ্ঠান, পালন করি, তখন আমাদের সার্বজনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জন স্বাস্থ্য ও পরিবেশের চিন্তা ভাবনা করাও বিশেষ প্রয়োজন হবে।

(৪) গনতান্ত্রিক রাজ্য : গনতন্ত্রে দেশের শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা জনগনের হাতে থাকে। তাদের ইচ্ছানুসার শাসন নির্ণয় এবং পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেয়। সকলের কল্যানের জন্য শাসনকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রতিটি মানুষ একত্রিত হওয়া সম্ভব না। তাই একটি, নির্দিষ্ট সময়ের পর নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে ভোটদাতা তার নিজের ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধী চয়ন করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধীরা সংবিধান দ্বারা গঠিত সংসদ কার্যপালিকায় প্রবেশ করেন। সংবিধানে উল্লেখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ জনগনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(৫) প্রজাতন্ত্র : আমাদের দেশে গনতন্ত্রের সাথে সাথে প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। প্রজাতন্ত্রে সকল সার্বজনিক পদ জনগনের দ্বারা নির্বাচন করা হয়। যে কোনো সার্বজনিক পদ বংশপরম্পরা থেকে হয় না।

রাষ্ট্রপতী, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, মূখ্যমন্ত্রী, মহাপৌর (মেয়ার), সরপঞ্চ এর মতো পদগুলি সার্বজনিক থাকে। ওই পদগুলিতে বিশেষ বয়সের অবস্থা পূর্ণ হওয়ার পর, যেকোনো ভারতীয় নাগরিক নির্বাচন দ্বারা পদে যেতে পারে। রাজসত্তা পদ্ধতীতে এই পদ বংশপরম্পরানুসার একই পরিবারের ব্যক্তির কাছে যায়।

আলোচনা করো।

'আমার পরিবার' বিষয়ে দীপা কি লিখেছে? তাহা পড়ো,

প্রজাতন্ত্র কথার অর্থ শুধুমাত্র নির্বাচন করা নয়। আমার মা-বাবা ঘরের সকল কাজ একত্রিত ভাবে করে। ওই কাজে আমি ও সহযোগিতা করি। একে-অপরের সঙ্গে বলার সময় সম্ভবৎ বাদবিবাদ না হয় তদরুপ বার্তালাপ করি। বাদ-বিবাদ হলে ও তা অতিশিঘ্র সমাধান করে একে অপরের কথা শুনে নেই। যদি ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা কোনো পরিবর্তন করতে চায় তাহলে ওনাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হয়। অনুজা কৃষিকার্যে অনুসন্ধান করতে চায়। তার এই নির্ণয় সকলের পছন্দ হয়েছে।

দীপাদের ঘরে প্রজাতন্ত্র পদ্ধতী প্রচলিত ছিল, এমন তোমার মনে হয় কি? এই পরিচ্ছেদে প্রজ াতন্ত্রের কি বিশেষতা পাওয়া যায়?

উদ্দেশিকা দ্বারা সকল ভারতীয় নাগরিকদের তিনটি মূল্যে ন্যয় স্বতন্ত্রতা এবং সমতা এর অনুসার আচরণ করার আইন তৈরী করে ওই মূল্যে প্রত্যক্ষরুপে ব্যবহার করার জন্য আশ্বাসন দেওয়া হয়েছে। এই মূল্যবোধের অর্থ আমরা বুঝে নেবো।

(১) ন্যায় : ন্যায় কথার অর্থ অন্যায় দূর করা এবং সকলকে উন্নতি করার সুযোগ দেওয়া মানে ন্যায়বিচার। সকল মানুষের কল্যান হবে এই দৃষ্টিকোনে ব্যবস্থা করা মানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। উদ্দেশিকায় ন্যায়বিচারের তিন প্রকার বলা হয়েছে। তাহা নিম্নরুপে

(অ) সামাজিক ন্যায় : ব্যক্তি-ব্যক্তির মধ্যে জাতি, ধর্ম বংশ, ভাষা, প্রদেশ, জন্মস্থান বা লিঙ্গের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোনো বৈশম্য করা উচিৎ নয়। সকলের মর্যাদা মানুষ হিসেবে সমান থাকে।

(ব) অর্থ নৈতিক ন্যায় : ক্ষুধা, অনাহার, কুপোষণ, গরীবতার জন্য বা দরিদ্রতার কারণে নির্মাণ হয়। যদি দরিদ্রতা দূর করতে হয় তাহলে প্রত্যেককে নিজের ও পরিবারের পালন পোষন করার জন্য উপজিবিকা করার সামুগ্রী প্রাপ্ত করার অধিকার রয়েছে।

আমাদের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে এই অধিকার, কোনো বৈষম্য ছাড়াই দেওয়া হয়েছে ।

(ক) রাজনৈতিক ন্যায়: দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য সকলে সমান অংশিদার হওয়া উচিৎ এই জন্য আমরা বয়স্ক ভোটদাতা পদ্ধতি স্বীকৃতি দিয়েছি। সেজন্য ১৮ বৎসর পূর্ন করা প্রত্যেক নাগরিককে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে।

(২) স্বতন্ত্রতা (স্বাধীনতা) : স্বাধীনতার অর্থ আমাদের উপর অন্যায় অযৌক্তিক এবং অনুচিৎ বিধিনিষেধ না রাখা, আমাদের ক্ষমতা বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ থাকা উচিৎ। গনতন্ত্রে নাগরিকদের স্বাধীনতা থাকে, স্বাধীনতা থাকলেই গনতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতা রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিক নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারে। চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান আমাদের সহযোগিতা এবং ঐক্য বাড়ায়, সেই সাথে একটি সমস্যার অনেক দিক বুঝতে পারে।

শ্রদ্ধা ভক্তি, বিশ্বাস উপাসনা স্বাধীনতা থেকে প্রধানতঃ ধার্মিক স্বাধীনতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নিজধর্ম বা নিজের পছন্দের ধর্মের শিক্ষা অনুসার ব্যবহার করার স্বাধীনতা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের রয়েছে। নিজ ধর্মের উৎসব অনুষ্ঠান পালন করার, ভক্তিস্থানে যাওয়ার ও উপসনার স্বাধীনতা রয়েছে।

(৩) সমতা : উদ্দেশিকায় ভারতীয় নাগরিকের মর্যাদা এবং সুযোগের ক্ষেত্রে সমানতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

জাতি, ধর্ম, বংশ, বর্ণ লিঙ্গ জন্মস্থান ইত্যাদির উপর ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেকেরই সমান মর্যাদা থাকবে, এই রুপ এর অর্থ। উঁচু-নীচ, শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ নিকৃষ্টের মধ্যে ভেদাভেদ না করাই সমান মর্যাদার নিশ্চয়তা। উদ্দেশিকায় 'সুযোগের সমানতা' মহত্বপূর্ণ মানা হয়েছে। আমাদের বিকাশের সুযোগ সকলে প্রাপ্ত করবে। তাহা উপলব্ধ করিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো ভেদাভেদ করা যাবে না।

সংবিধানের উদ্দেশিকায় একটি আলাদা আদর্শ বা উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। ওই আদর্শ বা তত্ব

আলোচনা করো।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নীচে দেওয়া হয়েছে। তাহা আলোচন করো।

- উৎসব অনুষ্ঠান সার্বজনিকভাবে উদযাপন করার কিছু নিয়ম পালন করা লাগে। সেজন্য আমাদের স্বাধীনতার উপর সীমাবদ্ধ থাকে না।
- স্বাধীনতা কথার অর্থ মনে যেমন হয়, তেমন ব্যবহার করা চলবে না। তবে দায়িত্ব নিয়ে ব্যবহার করা।

বন্ধুত্বভাবনার নির্মাণ করার উদ্দিষ্ট এবং ব্যক্তির খ্যাতি টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা করা হয়েছে।

বন্ধুতা (ভ্রাতৃত্ব) : সংবিধান প্রনেতারা ভেবেছিলেন শুধু ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সমতার নিশ্চয়তা দিয়ে ভারতীয় সমাজে সমতা নির্মাণ করা যাবে না। তার জন্য যত আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন, যত সময় পর্যন্ত ভারতীয়দের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব গড়ে উঠবে না, তত সময় পর্যন্ত এই আইনগুলি কার্যকর হবে না। তাই ভ্রাতৃত্ব তৈরীর উদ্দেশ্য উদ্দেশিকায় সমাবেশ করা হয়েছে। ভ্রাতৃত্ব থাকা মানে আমাদের দেশের সকল নাগরিকের সাথে এবং একে-অপরের জন্য সহানুভূতির অনুভূতি ভাবনা তৈরী করে, বন্ধু ভাব তৈরী হবে। একে-অপরের সমস্যা নিয়ে সংবেদশীলভাবে চিন্তা করবে।

ভ্রাতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিকটের ঘনিষ্ঠ সমন্ধ রয়েছে। ব্যক্তিত্ব মর্যাদা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানুষ হিসেবে সম্মান থাকে। জাতি, ধর্ম, বংশ, লিঙ্গ, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে নির্ধারন হয় না। আমরা যেমন চাই অন্যরা আমাদের সম্মান ও মর্যাদার সাথে আচরণ করুক আমাদের ও অন্যদের সাথে সম্মান ও মর্যাদার সাথে আচরণ করা উচিৎ।

যখন প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে আদর করে তার স্বাধীনতা ও অধিকারের সম্মান করবে, তখন

ব্যক্তির খ্যাতি স্বয়ং ক্রিয়াভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন পরিবেশে ন্যায় বন্ধুভাব সহজভাবে বেড়ে উঠবে। ন্যায় ও সমতার উপর ভিত্তি করে নতুন সমাজের গঠন হওয়ার কাজ অধিক সহজ হবে। ভারতের সংবিধানের উদ্দেশিকায় এর মার্গদর্শন পাওয়া যাবে।

ভারতের জনগন এই সংবিধান স্বয়ং অর্পন করেছে এই উল্লেখ করে উদ্দেশিকার পর্ব শেষ করা হলো।

অনুশীলনী

১. খোঁজ করো এবং লেখো।

স	ধ	র্ম	নি	র	পে	ক্ষ
মা	সা	র	না	মা	বি	চা
জ	ব	ন্ধু	তা	স	ম	তা
যা	প্র	জা	ত	ন্ত্র	ন্যা	য়
ঙ্গ	স্তা	ব	না	র	ক্ষ	মা

১. দেশের সকল নাগরিকের প্রতি এবং একে অপরের প্রতি ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি থাকা।

২. দেশের শাসন ব্যবস্থা জনগনের হাতে থাকা।

৩. উদ্দেশিকা বলা হয়।

৪. সকল ধর্মকে সমান মনে করা।

২. লেখন করবো।

(১) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিধান কি থাকে?

(২) বয়স্ক ভোটদান পদ্ধতী কথার অর্থ কি?

(৩) অর্থ নৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য নাগরিকেরা কোন অধিকার পায়?

(৪) সমাজে ব্যক্তিত্ব কিভাবে তৈরী হবে?

৩. আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীনতার ব্যবহার কিভাবে করা উচিৎ, তোমার মতামত লেখ/বলো।

৪. সংকল্পনা স্পষ্ট করো।

১. সমাজতান্ত্রিক রাজ্য

২. সমতা

৩. সার্বভৌম রাজ্য

৪. সুযোগের সমতা

৫. ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশিকায় কোন-কোন মহত্বপূর্ন সিদ্ধান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়?

উপক্রম

(১) শিক্ষকের সাহায্যে ব্যালট পেপার এবং ভোটিং মেশিন (EVM) বুঝে নেওয়ার জন্য তহশিল কার্যালয়ে দেখা করো।

(২) তোমার পরিবেশে সংবাদপত্রের নামের তালিকা তৈরী করো।

৩. সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

পেছনের দুটি পাঠ্যংশে আমরা ভারতের সংবিধান নির্মিতী এবং সংবিধানের উদ্দেশিকা অধ্যয়ন করেছি। সার্বভৌম, সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গনতন্ত্র, গনরাজ্য এই শব্দ বা ধারণাগলি বুঝে নিয়েছি। উদ্দেশিকায় উল্লেখিত এই উদ্দিষ্ট্য গুলি আমাদের সংবিধানের বিশেষতা ব্যতিরিক্ত অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য আছে ইহা আমরা এই পাঠে বুঝে নেবো।

সংঘরাজ্য (কেন্দ্রশাসন) : সংঘরাজ্য ব্যবস্থা এটি আমাদের সংবিধানের একটি মহত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট রয়েছে। বৃহৎ ভু-প্রদেশ এবং খুব জনসংখ্যা থাকা দেশের মধ্যে রাজ্য করা সংঘরাজ্য শাসন একটি পদ্ধতি আছে। বৃহৎ ভু-প্রদেশ হলে এক স্থান থেকে শাসন করা কঠিন হয়, দুরবর্তী প্রদেশ গুলির দিকে দুর্লক্ষ্য হয়। সেখানকার জনগন শাসন ব্যবস্থায় সহভাগী হওয়ার সুযোগ পায় না। অতএব সংঘরাজ্যে দুই স্তরের শাসন সংস্থা থাকে। সম্পূর্ণ দেশের সুরক্ষা করা, বিদেশের সঙ্গে ব্যবহার করা, শান্তি প্রস্তাবিত করার ইত্যাদি কার্য মধ্যবর্তী শাসন পরিপূর্তি করে, তাকে 'কেন্দ্রশাসন' বা 'সংঘশাসন' বলা হয়। সংঘশাসন সম্পূর্ণ দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

আমরা যে প্রদেশে বাস করি ওই প্রদেশের শাসন দেখা শোনা শাসনকে 'রাজ্যশাসন' বলা হয়। রাজ্য শাসন একটি সীমিত প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা দেখাশোনা করে।

যেমন মহারাষ্ট্র রাজ্যশাসন 'দুটি স্তরে ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ে আইন পাস করে পরাস্পরিক সহযোগিতা করে রাজ্য শাসনব্যবস্থা করার এই পদ্ধতীকে 'সংঘরাজ্য বলা হয়।

অধিকার বিভাজন: সংঘশাসন ও রাজ্যশাসন এর মধ্যে সংবিধানে অধিকার ভাগ করে দিয়েছে। এই নিয়মনুসার কোন বিষয়ের অধিকার কার কাছে আছে, তা দেখবো। আমাদের সংবিধানে তিনটিসুচী তৈরী করেছিল ও তাহাতে বিবিধ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম তালিকাটিকে 'সংঘসূচী' বলা হয়। তাতে ৯৭ টি বিষয় রয়েছে এই বিষয়ে সংঘশাসন আইন তৈরী করে। রাজ্য শাসনের জন্য 'রাজ্যসূচী' রয়েছে তাহাতে ৬৬টি বিষয় রয়েছে। এই বিষয়ের উপর রাজ্যশাসন আইন তৈরী করে। এই দুটি সূচী ব্যতিরিক তৃতীয় একটি 'সমবর্তী সূচী' রয়েছে তাহাতে ৪৭টি বিষয় আছে। উভয় শাসনের এই তালিকার বিষয় আইন করতে পারে। এই তিনটি তালিকার বিষয় ব্যতিরিক্ত যেকোনো একটি নতুন বিষয় নির্মাণ হলে তার উপর আইন বা নিয়ম তৈরী করার অধিকার সংঘশাসনের থাকে। এই অধিকার 'অন্তিম অধিকার' হিসেবে জানা হয়।

তুমি জানো কি ?

ভারতবর্ষে সংঘরাজ্যের অধিকার বিভাজন খুব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ছিল। সংঘশাসন এবং রাজ্যশাসন একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। রাজ্য শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগন সহভাগী হতে এই পদ্ধতীতে প্রেরনা পায়।

কোন বিষয় কার কাছে ছিল -

(১) সংঘশাসনের অধিনস্ত বিষয় : রক্ষা, বিদেশ নীতি, যুদ্ধ এবং শান্তি, মূদ্রা ব্যবস্থা, আন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবসা ইত্যাদি।

(২) রাজ্য শাসনের অধিনস্ত বিষয় : কৃষি, আইন এবং ব্যবস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য, কারাগৃহ প্রশাসন ইত্যাদি।

(৩) দুটি শাসনের সংযুক্ত অধিনস্ত বিষয় : কর্মসংস্থান, পরিবেশ, আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, ব্যক্তিগত আইন, শিক্ষা ইত্যাদি।

সংঘশাসিত প্রদেশ/কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ: ভারতে একটি সংঘশাসন ২৮টি রাজ্য শাসন বা অঙ্গরাজ্য এবং ৯টি সংঘশাসিত (কেন্দ্রশাসিত) প্রদেশ আছে।

কেন্দ্রশাসিত প্রদেশে কেন্দ্র সরকারের নিয়ন্ত্রন থাকে। নতুনদিল্লি, দমনদ্বীপ, পুদুচেরি, চণ্ডীগড়, দাদরনগর হাবেলি আন্দামান-নিকোবর লক্ষদ্বীপ, জম্মু ও কাশ্মীর, লদাখ, এগুলি কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ।

করে দেখো

উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের তালিকা তৈরি করো। সেখানের রাজ্যের রাজধানীর শহর কোনটি?

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা : ভারতের সংবিধান দ্বারা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার বিধান করা হয়েছে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা হলো এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সংসদের অর্থাৎ আইনসভার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার থাকে । ভারতের সংসদে রাষ্ট্রপতি, লোকসভা এবং রাজ্যসভা এদের সমাবেশ থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবে শাসন চালানোর মন্ত্রিসভা লোকসভা দ্বারা গঠিত করা হয় এবং তারা প্রশাসনিক কাজের জন্য লোকসভার প্রতি দায়ী থাকে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদে হওয়া আলোচনা, বিচার-বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ থাকে।

তুমি জানো কি ?

প্রচলিত নোট

তোমরা প্রচলিত নোট দেখেছ কি? তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রত্যাভুত চিহ্নিত থাকে ।

পুলিশদের কাঁধে লাগানো ব্যাজটি তোমরা দেখেছো হয়তো তাহাতে লেখা আছে, 'মহারাষ্ট্র পুলিশ'।

তোমরা 'ভারতীয় রেল' এবং 'মহারাষ্ট্র রাজ্য পরিবহন মহামন্ডল' পড়েছো হয়তো ।

এর অর্থ আমাদের দেশে দুই স্তরে সরকার রয়েছে। একটি ভারত সরকার এবং অন্যটি রাজ্য সরকার যেমন- মহারাষ্ট্র সরকার, কর্ণাটক সরকার ইত্যাদি।

মহারাষ্ট্র পুলিশ

ভারতীয় রেল

মহারাষ্ট্র রাজ্য পরিবহন মহামণ্ডল

স্বাধীন ন্যায় ব্যবস্থা : ভারতের সংবিধান দ্বারা একটি স্বাধীন ন্যায় ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। বিতর্কিত বিষয়গুলি যখন নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্নভাবে সমাধান না হয় তখন সেগুলি আদালতে উপস্থাপন করা হয়। আদালতে উভয় পক্ষের অভিযোগ শুনে নিয়ে, অন্যায় থাকলে তা দুর করে তার সমাধান করে। এই কাজটি নিরপেক্ষভাবে হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

আদালতের উপর যাতে কোনো চাপ না পড়ে তার জন্য সংবিধানে বিচার বিভাগকে স্বাধীন রাখার জন্য অনেক বিধান তৈরি করা হয়েছে। যেমন- বিচারপতির (ন্যায়াধীশের) নিযুক্ত সরকার দ্বারা না করে রাষ্ট্রপতি দ্বারা করা হয়। বিচারপতিদের সহজভাবে তাদের পদ থেকে সরানো যায় না।

একক নাগরিকত্ব: ভারতের সংবিধানে ভারতের সকল নাগরিককে একই নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। সেটা হলো 'ভারতিয় নাগরিকত্ব'।

সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতি : সংবিধানে উল্লেখিত বিধানগুলিতে পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন অথবা সংশোধন করতে হয়। কিন্তু সংবিধানের বারবার সংশোধন ও পরিবর্তন করলে অস্থিরতা অথবা অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে। অতএব, কোনো প্রকারের সাংবিধানিক পরিবর্তনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ভারতের সংবিধানেই স্পষ্ট

করা হয়েছে যাতে কোনো পরিবর্তন করার সময় এটি সম্পূর্নরূপে বিবেচনা করা হয়। সংবিধানের প্রত্যেক ধরনের সংশোধন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা প্রয়োজন। সংবিধান পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এটি খুব কঠিন কিছু নয় এবং খুব সহজও নয়। গুরুত্বপূর্ন সংশোধনগুলো নিয়ে বিচার বিনিময়ের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয় । সাধারন সংশোধনগুলি খুব সহজে হয়ে যাবে এমন অনেক নমনীয়তাও এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

খোঁজ করো

ভারতীয় সংবিধান এ পর্যন্ত কতবার সংশোধিত হয়েছে ?

নির্বাচন আয়োগ : নির্বাচন আয়োগ সম্পর্কে তোমরা সবসময় সংবাদপত্রের লেখা, পড়ো হয়তো। ভারতে গনতান্ত্রিক শাসন গ্রহন করার কারনে জনসাধারন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নিজের প্রতিনিধি আবার নুতন করে নির্বাচিত করে। সেই জন্য নির্বাচন করতে হয়। এই নির্বাচন একটি উন্মুক্ত ও

বলো দেখি!

বর্তমান নির্বাচন আয়ুক্ত কে?

নির্বাচনী আচারসংহিতার অর্থ কি?

নির্বাচনী এলাকা কাকে বলে?

নিসপক্ষপরিবেশে হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তবেই নাগরিকরা কোনো চাপ ছাড়াই যেটা সঠিক মনে করবে এমন প্রার্থীকে নিতে পারবে। শাসন নির্বাচন করলে এমন মুক্ত ও নিসপক্ষ পরিবেশ পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা থাকে না। তাই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করার দায়িত্ব একটি স্বাধীন সংস্থাকে অর্পন করা হয়। সেই সংস্থাই নির্বাচন আয়োগ। ভারতের সকল গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনা নির্বাচন আয়োগ করে।

ভারতিয় সংবিধানের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই পাঠে আমরা তার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টের অধ্যয়ন করেছি । মৌলিক অধিকারের বিস্তারিত বিধান আমাদের সংবিধানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমরা পরবর্তী পাঠে সেগুলি অধ্যয়ন করবো ।

অনুশীলনী

১. কেন্দ্রশাসন প্রনালি অনুসারে অধিকারের বিভাজন কিভাবে করা হয়েছে তার নিম্নলিখিত তালিকা তৈরি করো।

কেন্দ্র শাসন	রাজ্য শাসন	যে বিষয় উভয় শাসনের কাছে রয়েছে
(১) ______	(১) ______	(১) ______
(২) ______	(২) ______	(২) ______
(৩) ______	(৩) ______	(৩) ______

২. সঠিক শব্দ লেখো।

(১) সম্পূর্ণ দেশ পরিচালনা করা ব্যবস্থা -

(২) নির্বাচন করানোর ব্যবস্থা -

(৩) দুটি তালিকা ছাড়াও অন্য তালিকা -

৩. লেখন করো।

(১) সংঘ রাজ্যে দুটি স্তরের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে

(২) শেষাধিকারের অর্থ কি?

(৩) সংবিধানে ন্যায়পালিকাকে স্বাধীন রেখেছে ।

৪. স্বাধীন ন্যায় বিভাগের লাভ এবং ক্ষতি এই বিষয়ে শ্রেণীতে গ্রুপ আলোচনার পরিচালনা করো।

৫. ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) ব্যবহার করলে কি সুবিধা হয়, এর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

উপক্রম

শ্রেণীকক্ষে একটি নির্বাচন আয়োগের প্রতিষ্ঠা করো। সেই নির্বাচন আয়োগের নির্দেশনায় শ্রেণীতে নির্বাচন পরিচালনা করো।

৪. মৌলিক অধিকার ভাগ-১

চলো খোঁজ করি

* বালকের অধিকার তোমরা জানো হয়তো । তাদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অধিকার বলতে পারবে কি ?
* মহিলাদের অধিকার, আদিবাসীদের অধিকার, কৃষকদের অধিকার এমন নামগুলি আমাদের জানা আছে। এই অধিকার সম্পর্কে আমাদের সকলের কিছু প্রশ্ন উপস্থিত হয়।
* অধিকারের ব্যবহার কি? সেই অধিকার আমাদের কে প্রদান করে?
* অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় কি?
* যদি এমন হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে কোথায় গিয়ে বিচার চাইবে?

খবরের কাগজ বা অন্য কোথাও তোমরা এমন ধরনের ফলক দেখেছ হয়তো। কোন একটি মিছিলে (রৈলী) কিছু দাবি করা হয় এবং এটি তার অধিকার বলা হয়।

আমাদের জন্মথেকে কিছু অধিকার প্রাপ্ত থাকে। জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে । তার সম্পূর্ন সুস্থতার জন্য সমাজ এবং শাসন চেষ্টা করে। সমস্ত ব্যক্তি যখন অন্যায় শোষন, ভেদাভেদ, বঞ্চিততা থেকে রক্ষা পাবে তখনই ব্যক্তিরা তাদের গুণাবলী ও কৌশলের বিকাশ করতে পারবে। অধিকার দাবি করার অর্থ, নিজের এবং সম্পূর্ন জনসংখ্যার বিকাশের জন্য একটি পোষক অবস্থার দাবি করা এবং তার জন্য জোর করে আগ্রহ করা।

এই পরিপুর্ততার অবস্থা নির্মাণ করার জন্য সংবিধানে ভারতের সকল নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে। এই গুলি মৌলিক অধিকার। সংবিধানে উল্লেখ

থাকায় তাদের আইনের মর্যাদা রয়েছে। এই অধিকারগুলি পালন করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ।

কল্পনা করো এবং লেখো ।

কুকুর, বিড়াল, গরু, মহিষ, ছাগল এই ধরনের প্রানী তোমরা পালন করো হয়তো। তোমরা তাদের খুব যত্ন করো এবং তাদের খুব ভালোবাসো।

যদি এই প্রানীরা কথা বলতে পারতো, তাহলে তারা তোমাদের কাছে কি অধিকার চাইতো?

সংবিধানে উল্লেখ করা আমাদের অধিকার:

সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের অধিকারের উল্লেখ আছে। এই অধিকারগুলি কি কি তাহা দেখবো ।

সমতার অধিকার: সমতার অধিকার অনুযায়ী রাজ্যে ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে উচ্চ - নিম্ন, ছোট-বড়, স্ত্রী- পুরুষ এমন ভেদাভেদ করে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে না। আইন সকলের জন্য একসমান। অনেক আইন এমন ও আছে যে আমাদের সুরক্ষা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বিচারে গ্রেপ্তার করার মত কার্য্য থেকে আমরা রক্ষা পাই। এমন সুরক্ষা দেওয়ার সময় শাসন ভেদাভেদ করতে পারে না।

চলো, আলোচনা করি।

নিয়মের সম্মুখে সকলকে সমান মনেকরে সকলকে সমান সুরক্ষা দেওয়ার কী লাভ হয় ?

সমতার অধিকারে অন্য কোন বিষয়ের সমাবেশ হয়? সরকারি চাকরি দেওয়ার সময় সরকার জাত, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো ভেদাভেদ করতে পারে না। আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতার অমানবীয় প্রথা আইনের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতা মেনে চলা একটি উল্লেখযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সমাজে সমতা সৃষ্টির জন্য এই প্রথা নির্মূলন করা হয়েছে। লোকের মধ্যে উচ্চ-নিম্ন এর পার্থক্য করে উপাধি প্রদান সংবিধানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন - রাজা, মহারাজা, রাওবাহাদুর ইত্যাদি।

তুমি জানো কি ?

সমাজে বৈষম্যতা, ভেদ নির্মাণ হয় এবং নাগরিকের মধ্যে ভেদাভেদ করে এমন উপাধি রাজ্য দিতে পারে না, কিন্তু যারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবময় কাজ করে তাদের জন্য সরকার পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষনের মতো উপাধি দেয়। ভারতরত্ন আমাদের দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানের উপাধি দেওয়া হয়।

সেনাবাহিনীতে বীরত্বের জন্য পরমবীর চক্র অশোক চক্র, বীর চক্রের মতো সম্মান পদক দেওয়া হয় ।

এই উপাধি দিয়ে সম্মান করার পর সেই ব্যক্তিকে কোনো প্রকারের বিশিষ্ট অধিকার অথবা বিশেষাধিকার প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু তাদের কর্মক্ষমতার গৌরভ এই উপাধি দ্বারা করা হয়।

স্বাধীনতার অধিকার: সংবিধান দ্বারা প্রদান করা এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, এতে ব্যক্তির প্রয়োজনিয় সব ধরনের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। আমরা একজন নাগরিক হিসেবে -

* ভাষণ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে।
* শান্তিপূর্ণভাবে একত্রিত হওয়া এবং সভা করার স্বাধীনতা আছে।
* কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থা গঠনের স্বাধীনতা আছে।
* ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনো জায়গায় চলাফেরার স্বাধীনতা আছে।
* ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনো জায়গায় বসবাস করার স্বাধীনতা আছে।
* নিজের পছন্দের ব্যবসা অথবা শিল্প করার স্বাধীনতা আছে।

করে দেখো।

এখানে 'অ', 'ব' এবং 'ক' দ্বারা করা কিছু কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তুমি এই কাজগুলি উপরে উল্লেখিত কোন স্বাধীনতার সাথে যোগ করবে?

আদিবাসী সমস্যা সমাধানের জন্য 'অ' আদিবাসী সহকারী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছে।

'ব' তার বাবার বেকরি উৎপাদনের ব্যবসা গোয়া থেকে মহারাষ্ট্রে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।

'ক' ব্যাক্তি সরকারের নতুন খাজনা নীতিতে কিছু দোষ অনুভব করেছে এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখে লোকটি সংবাদপত্রে দিয়েছে।

তুমি জানো কি ?

সংবিধান আমাদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু তাহা দায়িত্বহীনভাবে ব্যবহার করা যায় না। এমন আচরনের জন্য অন্য কাহারো ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। আমাদের কথা বলার অধিকার আছে, কিন্তু উত্তেজক লেখন অথবা ভাষণ করা যাবে না।

সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকার দ্বারা আমরা শুধু হাঁটা-চলা এবং কথা বলতে পারি তা নয়, আমরা যাতে সুরক্ষিত থাকতে পারি এই আইন উপলব্ধ করে দিয়েছে। আইনে সকলকে সমানভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। যেমন- আমাদের সকলেরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার সহজ মনে হলেও এর অনেক অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। বেঁচে থাকার গ্যারান্টি এবং বেঁচে থাকার জন্য পোষক ও অনুকূল পরিস্থিতি এমন এর অর্থ হয়। কোনো ব্যাক্তির জীবন কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কারন ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করা যাবে না। স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে এখন শিক্ষার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকল ছেলে মেয়েদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের কারনে কেউ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

ভেবে দেখো।

জীবন থেকে বঞ্চিত না হয় এমন অধিকারের আরও কিছু পূরক অধিকার রয়েছে। যেমন - একই অপরাধের জন্য দুই বার শাস্তি দেওয়া যায় না। কাউকে শাস্তি দেওয়ার আগে তার উপর অভিযোগ প্রমাণ করতে হয়। এই কাজ আদালত দ্বারা করা হয়। পুলিশ প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করে। আমি অপরাধ করেছি এমন বলা লোকের তৎক্ষণিকভাবে শাস্তি হয় না। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আইন দ্বারা প্রমান করতে হয়। এই সমস্ত আদালতের প্রক্রিয়া করার জন্য সময় লাগে, কিন্তু কোনোও নিষ্পাপ অথবা নিরপরাধ ব্যক্তির যেন শাস্তি না হয় তার জন্য এটা খুব প্রয়োজন।

শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার : শোষণ বন্ধ করার জন্য শোষনের শিকার না হয়ে, নিজেদের উপর শোষন অথবা অত্যাচার না হয়, একে শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার বলা হয়।

সংবিধান দ্বারা একদিকে শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার থেকে সব ধরনের শোষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে শিশুদের শোষণ বন্ধ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে । তদনুসারে, ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের বিপদজনক জায়গায় নিয়োগ (রাখা) নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কারখানা এবং খনির মতো জায়গায় শিশুদের নিয়োগ করে তাদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না।

কোনো একজন ব্যক্তিকে বাধ্য করে বা জোর করে, তার ইচ্ছা না থাকা সত্তে ও তাকে দিয়ে কাজ করানো,

কিছু ব্যক্তিদের সাথে গোলামের মতো আচারণ করা, তাদের কাজের উপযুক্ত মজুরি না দেওয়া, তাদের দ্বারা খুব কষ্ট করিয়ে নেওয়া, তাদের ক্ষুধার্ত রাখা, এবং অত্যাচার করা এসব এক ধরনের শোষণের প্রকার। শোষণ সাধারনত নারী, শিশু সমাজের দুর্বল ঘটক, এবং সত্তাহীন লোকের হয়। যেকোনো প্রকারের শোষন হলে, সেই শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অধিকার রয়েছে।

চলো, চর্চা করি:

- শিশু শ্রমিক এখানে কাজ করে না।
- এখানে শ্রমিকদের দৈনিক বেতন দেওয়া হয়।

তোমরা অনেক দোকানে কিংবা হোটেলে এমন ধরনের বোর্ড দেখেছো। সেই বোর্ডের এবং সংবিধানের অধিকারের মধ্যে সম্পর্ক কি?

চলো, চর্চা করি:

প্রতিটি ব্যক্তি যেন তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, তার কোনো প্রকারের শোষন না হয় সেইজন্য শরকার অনেক আইন তৈরি করেছে। এখানে কিছু আইনের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আর কোন আইন আছে তাহা খুঁজে বের করো এবং সেগুলি নিয়ে আলেচনা করো।

- ন্যূনতম মজুরি আইন - কারখানার কাজের সময়, বিশ্রামের সময় এই সম্বন্ধে অধিনিয়ম।
- গৃহস্থ হিংসা থেকে নারীদের রক্ষা করার আইন - ....

এই পাঠে আমরা ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত সমতা, স্বাধীনতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার নিয়ে পড়াশোনা করেছি। পরাবর্তী পাঠে আমরা আরো কিছু মৌলিক অধিকারের অধ্যয়ন করবো ।

অনুশীলনী

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো।**

(১) মৌলিক অধিকারের অর্থ কি?

(২) যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবময় কাজ করে তাদের সরকার কোন পদক/পদবি প্রদান করে?

৩. চৌদ্দ বছরের কম বয়সী শিশুদের বিপদজনক স্থানে রাখা নিষেধ করা হয়েছে কেনো ?

৪. সংবিধান ভারতের সকল নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে কেনো ?

২. ‘স্বাধীনতার অধিকার’ এই বিষয়ে চিত্রতালিকা তৈরি করো।

৩. **নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সংশোধন করে পুনরায় লেখো।**

(১) জন্ম থেকে কোনো ব্যক্তির অধিকার থাকে না।

(২) সরকারি চাকরি দেওয়ার সময়, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্মস্থান এমন ভেদাভেদ করে সরকার তোমাকে চাকরির থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে।

৪. নিম্নলিখিত সংকল্পনা চিত্র পূর্ণ করো ।

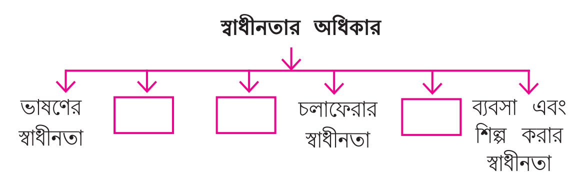

উপক্রম

১. সংবাদপত্র থেকে তথ্য (জানকারি) অধিকার, শিক্ষার অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সংগ্রহ করো ।

২. তোমাদের এলাকায় ভবন নির্মানের কাজে যদি ছোট বালকদের কাজ করতে দেখা যায়, তাহলে তার এবং তার পিতামাতার সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে জানো এবং শ্রেনীতে সেই সমস্যাগুলি উপস্থাপন করো ।

৫. মৌলিক অধিকার ভাগ-২

আগের পাঠে আমরা ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা দেওয়া কিছু মৌলিক অধিকারের বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি। আমরা সমতা, স্বাধীনতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের অধ্যয়ন করেছি। এই পাঠে আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত অধিকার বুঝে নেবো । তেমনই মৌলিক অধিকারের আদালতের সুরক্ষা সম্পর্কেও জেনে নিতে হবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার : ভারত বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এটা আমরা জানি। আগের শ্রেনীতে এটি আমরা পড়েছি, কিন্তু এই বিষয়ে সংবিধানে কী লেখা আছে তাহা জানার জন্য তোমাদের মনে আগ্রহ আছে কি? তাহলে তার উল্লেখ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারে রয়েছে। এই অনুযায়ী, ভারতের প্রতিটি নাগরিকের যেকোনো ধর্মের পূজা করার এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংস্থা প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার আরও বিস্তৃত করার জন্য ধর্মীয় বিষয়ের দুটি বিষয়কে অনুমতি দেয়নী (১) যে কর একটি নির্দিষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়, এমন কর সরকার আরোপ (আদাই) করতে পারে না। সংক্ষেপে সংবিধানে ধর্মীয় কর আরোপ নিষিদ্ধ। (২) সরকার থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না ।

সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার অধিকার : আমাদের দেশে উৎসব, অনুষ্ঠান, আহার এংব জীবন পদ্ধতির অনেক বিবিধতা আমরা দেখতে পাই। তোমরা বিবাহ অনুষ্ঠান দেখেছো হয়তো, সেখানে বিভিন্ন বিবাহের পার্থক্যটি অবশ্যই অনুভব করেছো । এই সমস্ত সব আলাদা-আলাদা কথা সেই-সেই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অংশ। আমাদের সংবিধান বিভিন্ন জাতিকে তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষার অধিকার দিয়েছে। এর অনুযায়ী আমাদের ভাষা, লিপি, সাহিত্যের সংরক্ষণ আমরা করতেই পারি, তবে একই সাথে তার উন্নয়নের জন্য চেষ্টাও করতে পারি। ভাষা উন্নায়নের জন্য সংস্থা স্থাপন করা যায় ।

খোজ করো এবং আলোচনা করো।

- সংবিধান কয়টি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে ?
- মারাঠি ভাষা প্রচারের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার কোন সংস্থা তৈরি করেছে ?

চলো, আলোচনা করি

মহারাষ্ট্রে সমস্ত সরকারী এবং আদালতের কাজ মারাঠিতে হওয়া উচিৎ, এমন তোমাদের মনে হয় কি? তার জন্য কি করতে হবে?

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার : অধিকারের উলঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আদালতে আপিল করার অধিকারও একটি মৌলিক অধিকার। একে সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার বলা হয়। এর অর্থ এই, যে অধিকার উলঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ নিস্পত্তির বিধান সংবিধান করেছে । তদনুসারে, অধিকার রক্ষা করা আদালতের জন্যও বাধ্যতামূলক।

সংবিধান দ্বারা দেওয়া অধিকারে কোনো সময় অতিক্রমন (দখল) হতে পারে, তখন আমরা আমাদের অধিকারের প্রয়োগ করতে পারি না। এটাকেই আমরা আমাদের অধিকার উল্লঙ্ঘন হয়েছে, এমন বলি। অধিকার উল্লঙ্ঘনের অভিযোগ আদালতে বিবেচনা করে। তার বিষয়ে তদন্ত করে যে সত্যিই অধিকার উলঙ্ঘন হয়েছে অথবা সেই ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করা হয়েছে এমন বুঝতে পারলে আদালত যথাযথ সিদ্ধান্ত দেয়।

অধিকার উলঙ্ঘনের কিছু প্রকার :

- বিনা কারণে কোনো ব্যক্তিকে বন্দী করা।
- উপযুক্ত কারণ ছাড়া একজনকে শহর/গ্রাম ত্যাগ করতে প্রতিরোধ করা।
- কারাগারে বন্দীদের খাদ্য, জল এবং ঔষধোপচার থেকে বঞ্চিত করা।

অধিকার উলঙ্ঘন প্রতিরোধে আদালতের নির্দেশ :

নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের বিভিন্ন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে।

(১) **বন্দিপ্রদর্শন (Habeas Corpus):** বেআইনি গ্রেপ্তার এবং স্থানবদ্ধতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করা।

(২) **পরমাদেশ (Mandamus):** জনস্বার্থের জন্য সরকারকে কোনো কাজের জন্য দেওয়া আদালতের নির্দেশ।

(৩) **নিষেধাজ্ঞা/প্রতিষেধ (Prohibition):** কনিষ্ঠ আদালত তার অধিকারের বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ।

(৪) **স্পষ্টীকরণ চাওয়ার অধিকার (Quo Warranto):** কোন অধিকারের অধিনে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, এ ধরনের স্পষ্টীকরণ সরকারি অধিকারির কাছে চাওয়ার আদালতের নির্দেশ।

(৫) **উৎপ্রক্ষণ (Certiorari):** কনিষ্ঠ আদালতের দেওয়া নির্ণয় বাতিল করে উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করবার জন্য নির্দেশ।

সরকারি অধিকারির এই ধরনের প্রতিক্রিয়াটি যোগ্য নাকি অযোগ্য?

নিরাধারের জন্য তৈরী একটি প্রকল্পের লাভ পাওয়ার আশায় এক মহিলা সমস্ত প্রয়োজনিয় কাগজপত্র নিয়ে জমা করে, কিন্তু অধিকারি সেই মহিলাকে বলেন যে তোমাকে নিরাধারের মত দেখা যায় না, মহিলার সুবিধাটি অস্বীকার করা সরকারি অধিকারির এই পদক্ষেপটি যোগ্য কি অযোগ্য?

উপরোক্ত মামলায় মহিলাটির অধিকার উলঙ্ঘন করা হয়েছে, তোমাদের এমন মনে হয় কি? তিনি যদি প্রতিকার চাইতে চান তাহলে তাকে কোথায় যেতে হবে?

আদালতের কাজকর্ম

এভাবে আদালতের সুরক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিকরা তাদের অধিকার যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে। এই অধিকারগুলি সচেতন, দায়িত্বশীল ও সক্রিয় নাগরিক হিসাবে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে। মৌলিক অধিকারের বিচার করার সময় আমাদের কর্তব্যের প্রতিও সচেতন হতে হবে। আমরা পরাবর্তী পাঠে এটি অধ্যয়ন করবো ।

অনুশীলনী

১. লেখন করো।

(১) সংবিধান ধর্মীয় খাজনা আরোপ নিষিদ্ধ করে।

(2) সাংবিধানিক প্রতিকারে অধিকার কথাটির অর্থ কি?

২. সঠিক শব্দ লেখো –

(১) অবৈধ ভাবে গ্রেপ্তার (বন্দী) এবং স্থানবদ্ধ থেকে সুরক্ষা –

(২) কোন অধিকারের দ্বারা এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে, সরকারি অধিকারির কাছে স্পষ্টিকরণ চাওয়ার আদালতের আদেশ –

(৩) জনস্বার্থে সরকারকে যেকোনো কাজ করতে দেওয়া আদালতের আদেশ –

(৪) কনিষ্ঠ আদালত নিজের অধিকারক্ষেত্রের বাইরে যাওয়া উচিৎ নয়, এই বিষয়ে দেওয়া নির্দেশ –

৩. আমরা এটি করতে পারি কেন, তার কারণগুলি সামনে লেখো।

(১) সকল ভারতীয় নাগরিক আনন্দের সাথে সমস্ত উৎসব পালন করতে পারে। কারণ.......

(২) আমি মারাঠি ভাষা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। কারণ........

৪. শূন্যস্থানে কোন শব্দটি লেখা উচিৎ!

(১) অধিকার উলঙ্ঘনের অভিযোগ .... বিবেচনা করে।

(২) সরকার থেকে আর্থিক সহয়তা প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে............. শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

উপক্রম

তোমাদের বিদ্যালয়ে বিচারক, উকিল, পুলিশ অধিকারিদের সাক্ষাতকারের পরিচালনা করো।

৬. নীতি নির্দেশমূলক সিদ্ধান্ত এবং মৌলিক কর্তব্য

আগের পাঠে আমরা সংবিধানের দেওয়া অধিকার বিষয়ে পড়েছি। সেখান থেকে ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার কি তাহা বুঝেছিলাম। শুধু তাই নয়, আমরা এটাও শিখেছি যে অধিকারগুলো আদালতের দ্বারা সুরক্ষিত । আমাদের মৌলিক অধিকারের ব্যক্তিগত এবং সার্বজনিক জীবনে গুরুত্বও বুঝতে পেরেছি। এই পটভূমিতে আমরা নির্দেশমূলক নীতি কাকে বলে সেটা বুঝে নেবো।

মৌলিক অধিকার সরকারের অধিকারের উপর সীমাবদ্ধ করে। নীচের তালিকা পড়ো তাহলে শাসনের উপর কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাহা বুঝতে পারবে। যেমন -

- সরকার নাগরিকদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে যেন ভেদাভেদ না করে ।
- আইনের সামনে সকলে সমান এবং আইনে সকলকে সমান ভাবে সুরক্ষা প্রদান করে এটি অস্বীকার করা উচিৎ নয়।
- কোনো ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নেওয়া চলবে না।
- ধর্মীয় কর আরোপ করা উচিৎ নয়।

শাসনের কি করা উচিৎ এবিষয়ে কিছু পরামর্শ সংবিধান দ্বারা স্পষ্ট করা হয়। এই নির্দেশাবলীর উদ্দেশ্য হলো সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট করা উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা। সেই কারনেই এই পরামর্শগুলিকে নীতি নির্দেশিকা বলা হয়।

নির্দেশমূলক নীতির সমাবেশ কেনো করা হয়েছে ?

ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন এই দেশে শৃঙ্খলা তৈরি করা, মসৃণভাবে (সুচারুভাবে) শাসন করা এটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো। দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, নিরক্ষরতা দূর করে দেশের শাসন ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থিত করার ছিলো। রাষ্ট্রনির্মাণ এবং বিকাশের কাজ করার ছিলো। তার জন্য নতুন-নতুন নীতি নিয়ে আসা এবং বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন ছিল। জনকল্যানের উদ্দেশ্য সার্থক করার লক্ষ ছিল। সংক্ষেপে ভারতের রূপান্তর একটি উন্নত এবং প্রগতিশীল দেশ নির্মান করার ছিল। এর জন্য কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার দ্বারা কোন বিষয়গুলিকে প্রথম অধিকার দেওয়া উচিৎ এবং জনগনের কল্যানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ এটি সংবিধানের নীতি নির্দেশিকা দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে। এই নীতি নির্দেশিকাকে, রাজ্য নীতির ভিত্তি তৈরী করেছে। প্রতিটি নির্দেশিকাতে রাজ্য নীতির জন্য একটি বিষয় আছে। গণপরিষদ এ বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। গণপরিষদ জানত যে এই সমস্ত নীতি একই সাথে এবং একবারে বাস্তবায়ন করতে প্রচুর আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। সে কারণেই তারা নীতি নির্দেশিকাকে মৌলিক অধিকারের মত সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক করেনি। সমস্ত রাজ্য ধীরে-ধীরে কিন্তু অবশ্যই সেই নীতিগুলি বাস্তবায়ন করবে এমন আশা সংবিধান প্রনেতারা ব্যক্ত করেছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্দেশিকা:

- সরকার সকলকে জীবিকার উপায় প্রদান করে দেওয়া উচিৎ। স্ত্রী এবং পুরুষের মত ভেদাভেদ করবে না।
- স্ত্রী এবং পুরুষদের সমান কাজের জন্য সমান বেতন দিতে হবে।
- জনগনের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা ব্যবস্থা করা।
- পর্যাবরণের রক্ষা করবে।
- রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্থাৎ স্মৃতিস্তম্ভ, স্থাপত্য (বাস্তু) রক্ষা করবে।
- সমাজের দুর্বল অংশের জন্য বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করে তাদের উন্নতির সুযোগ করে দেওয়া উচিৎ।
- বৃদ্ধাবস্থা, অক্ষমতা, বেকারত্ব থেকে নাগরিকদের রক্ষা করবে।
- ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সমান নাগরিকত্ব আইন করা প্রয়োজন ।

বলো দেখি?

বেতনের সন্দর্ভে সমান কাজের জন্য সমান বেতন ইহা নীতি নির্দেশিকা সিদ্ধান্তে বলে। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা সংবিধানের কোন-কোন উদ্দেশ্য সফল হবে এমন তোমাদের মনে হয় । স্ত্রী-পুরুষ সমান কাজ করে তথাপি পুরুষ জাতির তুলনায় স্ত্রীজাতির বেতন প্রায়ই কম দেখতে পাওয়া যায় কেনো?

করে দেখো

উপরে লেখা নীতি নির্দেশিকা সিদ্ধান্তের অতিরিক্ত অন্য নীতি নির্দেশিকা সিদ্ধান্ত এই স্পষ্ট করে যে সরকার লোক কল্যানের জন্য কি-কি করা উচিৎ। নিচে কিছু বিষয় দেওয়া আছে । এই সন্দর্ভে কোন-কোন নীতি নির্দেশিকা সিদ্ধান্ত আছে তাহা শিক্ষকের সাহায্যে খুঁজে বের করো।

যেমন - বিদেশ নীতি: বিশ্বশান্তি এবং পারস্পরিক সৌহার্দের প্রাথমিকতা দেওয়া।

(অ) মেয়েদের শিক্ষা: ....

(ব) স্বাস্থ্ এবং আনন্দময় বাতাবরনে ছেলে মেয়েদের ভরন-পোষন: ....

(ক) কৃষি কার্যের উন্নয়ন করা: ....

নীতি নির্দেশিকা এবং মৌলিক অধিকার একই মুদ্রার দুটি দিক রয়েছে। মৌলিক অধিকারের জন্য নাগরিকরা তাদের অতিপ্রয়োজনীয় স্বাধীনতা পেয়ে থাকে আর নীতি নির্দেশিকা গণতন্ত্রের মতোই একটি পুষ্টিকর পরিবেশ তৈরী করে। অর্থাৎ যদি সরকার কোনো নীতি নির্দেশিকার পালন না করে তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারি না, তবে সরকারের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে নীতিমালা নিশ্চিত করার জন্য আগ্রহ করতে পারি।

তোমাদের অনুযায়ী সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর কি-কি করা প্রয়োজন? তোমাদের চাহিদার একটি তালিকা তৈরী করো। তোমাদের চাহিদা উচিৎ এবং সঠিক তাহার প্রমান কিভাবে দিবে?

তোমাদের নজরে সরকার দ্বারা দেওয়া নিচের সুবিধাগুলির কারণে কি-কি উন্নয়ন হতে পারে?

(অ) সার্বজনিক স্বচ্ছতাগৃহ

(ব) বিশুদ্ধ জলাপূর্তি

(ক) শিশুদের টিকাকরণ

মৌলিক কর্তব্য

গনতন্ত্রে নাগরিকদের দ্বিগুণ দায়িত্ব থাকে। একদিকে তাদের সংবিধান দ্বারা দেওয়া অধিকারের প্রতি সচেতন থাকতে হয়। অধিকারের যাতে উলঙ্ঘন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়, তারপর অন্য কিছু কর্তব্য এবং দায়িত্বও পালন করতে হয়। সমস্ত ভারতীয়দের যাতে কল্যাণ হয়, তাই সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত মৌলিক অধিকার এবং নীতি নির্দেশিকা এর মধ্যে অনেক বিধান করা হয়েছে, কিন্তু যতদিন নাগরিকরা তাদের মৌলিক দায়িত্ব পালন করবে না, ততসময় সরকারের দ্বারা করা সংস্কারের সুফল সকলে পাবে না। যেমন - স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অধিনে সরকার বেশ কয়েকটি স্বাচ্ছতা বিষয়ে উপক্রম শুরু করেছে। কিন্তু জনসাধারনের দ্বারা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করার অভ্যাসটি পরিবর্তন করা উচিৎ । ভারতীয় নাগরিকের নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য নিম্নলিখিত রূপে:

- প্রত্যেক নাগরিককে সংবিধান মেনে চলতে হবে। সংবিধানে উল্লেখিত জাতীয় পতাকা এবং রাষ্ট্রগীতের আদর্শকে সম্মান করবে ।
- স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করা আদর্শকে মেনে চলবে ।

- দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখণ্ডতা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করবে।
- নিজের দেশকে রক্ষা করবে। দেশের সেবা করবে ।
- সকল প্রকারের ভেদাভেদ ভুলে ঐক্য বৃদ্ধি করবে এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাব গড়ে তুলবে।
- স্ত্রীজাতির প্রতিষ্ঠাকে ক্ষুন্ন করে এমন প্রথাকে ত্যাগ করা উচিৎ।
- আমাদের সম্মিলিত সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করবে ।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করো । সকল জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবে।
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, মানবতাবাদ এবং কৌতূহলকে অবলম্বন করো।
- সার্বজনীক সম্পত্তির রক্ষা করো। হিংসার ত্যাগ করো।
- দেশকে প্রগতিশীল অগ্রগতির জন্য ব্যক্তিগত এবং সামুহিক কাজের শ্রেষ্ঠত্বের স্তর প্রাপ্ত করার চেষ্টা করো ।
- ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী নিজের সন্তানদের তার অভিভাবক শিক্ষার সুযোগ করে দিবে।

তালিকা তৈরি করো।

- তোমরা বাড়িতে কি-কি অধিকার চাও এবং কোন দায়িত্ব পালন করো?
- বিদ্যালয়ে তোমরা কোন দায়িত্ব পালন করো? সেখান থেকে তোমার কোন দায়িত্বটি অপছন্দ?

ছেলেটি স্মৃতিস্তম্ভের উপর নাম খোদাই করছে

লেবু মরিচ ঝুলানো

বাস ভাংচুর করা

মহিলারা রাস্তায় ময়লা ফেলছেন

তোমাদের মতে এসব ছবিতে কোন দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে না?

উপরোক্ত সংলাপগুলি থেকে আমাদের কোন কোন কর্তব্যের বোধ হয়? অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি? তোমাদের মতে কর্তব্য পালন করলে কি হয়?

তোমাদের কি মনে হয়?

৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এই আয়ুবর্গের প্রত্যেক ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহলেও অনেক কারনের জন্য ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। মা-বাবার আর্থীক সহায়তা করবার জন্য কাজ করতে হয়। এমন ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার আগ্রহ করলে তার উপর অন্যায় করা হবে এমন তোমাদের মনে হয় কি?

এই পাঠ্যপুস্তকের প্রারম্ভিক পাঠে আমাদের ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য এবং বিশেষতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ভারতীয় নাগরিকের অধিকার এবং সেই অধিকারের প্রাপ্ত সংরক্ষণেরও আমরা বিচার বিবেচনা করেছি। পরাবর্তী বছরে আমরা আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থা কেমন ভাবে চলে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন করবো।

অনুশীলনী

১. সরকারের উপর কি-কি বন্ধন থাকে, নিম্নলিখিত চৌকোটে তালিকা তৈরি করো।

- ....
- ....
- ....

২. নিম্নলিখিত বিবৃতি পড়ে হ্যাঁ/না তে উত্তর লেখো।

(১) খবরের কাগজে দেওয়া চাকরির বিজ্ঞাপনে স্ত্রী এবং পুরুষদের জন্য জায়গা থাকে....

(২) একই কারখানায় একই কাজকরা স্ত্রী-পুরুষের বেতন আলাদা - আলাদা থাকে...........

(৩) স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে...........

(৪) রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোনে গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ এবং স্থাপত্যগুলির রক্ষা করা উচিৎ ....

৩. কেন, তাহা বলো –

(১) ঐতিহাসিক স্থাপত্য, ভবন, স্মৃতিস্তম্ভ গুলির রক্ষা করবে।

(২) বৃদ্ধদের জন্য পেনশন স্কিম পরিচালনা করা হয়।

(৩) ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

৪. এটা সঠিক না ভুল, কেনো তাহা বলো । ভুল বক্তব্যটি সংশোধন করো।

(১) জাতীয় পতাকা যেন মাটিতে পড়ে না যায় ।

(২) রাষ্ট্রগীত শুরু থাকলে সাবধান স্থিতিতে দাড়াতে হয়।

(৩) আমাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ ও স্থাপত্যের উপর নিজের নাম লেখা/খোদাই করা ।

(৪) একই কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় স্ত্রী দের কম বেতন দেওয়া।

(৫) সার্বজনীক স্থানগুলি পরিষ্কার রাখা।

৫. লেখন করো।

(১) সংবিধানের কিছু নীতি নির্দেশ মূলক সিদ্ধান্ত পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি কি?

(২) ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত নীতি নির্দেশিকায় সকল নাগরিকের জন্য সমান নাগরিক আইনের বিধান করা হয়েছে কেনো?

(৩) নীতি নির্দেশিকা এবং মৌলিক অধিকার একই মুদ্রার দুটি দিক, এমন কেনো বলা হয়?

৬. নাগরিকরা কীভাবে পরিবেশের যত্ন এবং সুরক্ষা করতে পারে তা উদাহরণ সহ লেখো।

উপক্রম

(১) শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের অধিকার, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের কর্তব্য কি, তা নিয়ে গ্রুপে আলোচনা করো।

(২) রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোনে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য, স্মৃতিস্তম্ভ এ সবের যত্ন করার জন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা করবে, এমন নীতি নির্দেশক সিদ্ধান্ত রয়েছে। দুর্গগুলির সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকার কি করেছে তা খুঁজে বের করো এবং একটি তালিকা তৈরি করো।

(৩) শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য সরকার কোন প্রকল্প চালায়, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

কালখন্ড - ৮ম শতাব্দী থেকে ১৯ শতাব্দী
প্রধান ঘটনাক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঘটনাক্রম নিচের থেকে উপরের দিকে পড়বে।

৮ শতাব্দী
- মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু আক্রমণ
- রাজপুত গহড়বাল পরমার রাজবংশ
- গুর্জর প্রতিহার সত্তা
- পাল রাজবংশ
- রাষ্ট্রকুট রাজবংশ, পান্ড্য রাজবংশ

৯ শতাব্দী
- শিলাহার রাজবংশ
- চোল রাজবংশ

১০ শতাব্দী
- রাজা জয়পাল সবক্তগীন সংগ্রাম

১১ শতাব্দী
- গজনীর মুহাম্মদের ভারতের উপর আক্রমণ
- ভারতে তুর্কিদের আক্রমণ
- হোয়সাল রাজবংশ

১২ শতাব্দী
- মুহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের রাজত্বের অবসান ঘটে
- যাদব রাজবংশ

১৩ শতাব্দী
- বারকরী পন্থ
- মহানুভাব পন্থ
- খিলজি রাজবংশের রাজেত্ব
- বলবন, রাজিয়া সুলতান, অল্টমাসের রাজেত্ব, কুতুবুদ্দিন ঐবক দিল্লির সুলতান

১৪ শতাব্দী
- বাহমনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা
- বিজয়নগর রাজ্যের স্থাপনা
- দিল্লর উপর তুঘলক সত্তা। দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরন এবং পুনঃ দিল্লিতে। তৈমুরলাং এর ভারতে আক্রমণ

১৫ শতাব্দী
- আদিলশাহী, নিজামশাহী, কুতুবশাহী, বারিদশাহী, ইমাদশাহীর রাজত্ব

১৬ শতাব্দী
- মহারানা প্রতাপ, চাঁদবিবি, রানীদুর্গাবতীর সাথে সম্রাট আকবরের সংগ্রাম
- মুঘল শাসন শুরু, বাবর হুমায়ুনের কার্যকাল
- দিল্লীর উপর সুলতানশাহি রাজত্বের অবসান ঘটে

১৭ শতাব্দী
- রানী তারাবাইয়ের কার্যকাল
- ছত্রপতি রাজারাম মহারাজ
- ছত্রপতি সম্ভাজি মহারাজ
- ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক
- *স্বরাজ্যের* স্থাপনা
- ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের কার্যকাল
- মহারাষ্ট্রে অকাল
- মুঘল-শিখ দ্বন্দ্ব
- আওরাঙ্গজেব
- শাহজাহান
- জাহাঙ্গীর

১৮ শতাব্দী
- দ্বিতীয় বাজিরাওএর কার্যকাল
- *স্বরাজ্য* থেকে সম্রাজ্য
- সওয়াই মাধবরাও
- নারায়নরাও
- জ্যেষ্ঠ মাধবরাও
- পানিপথের যুদ্ধ
- নানাসাহেব পেশওয়া
- মারাঠাদের হাতে পর্তুগিজদের পরাজয়
- প্রথম বাজিরাওএর কার্যকাল
- ছত্রপতি শাহুজী মহারাজের কার্যকাল

১৯ শতাব্দী
- মারাঠারা ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হয়

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ

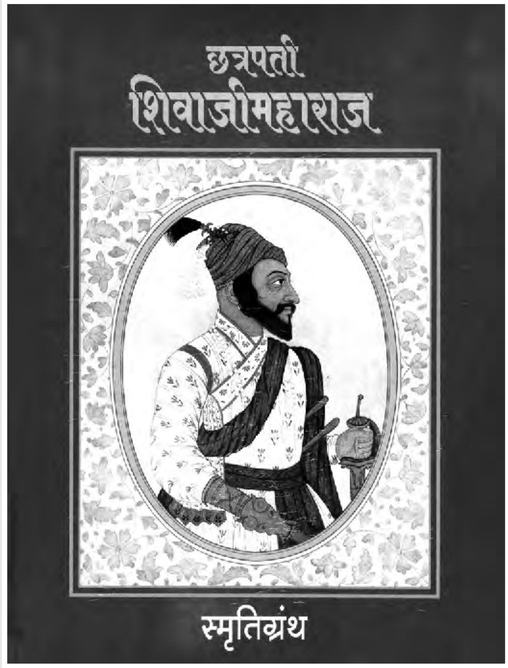

- सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या स्वराज्य स्थापनेची कथा उलगडणारे पुस्तक.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तुंग कार्य व त्यामागची तेवढीच उत्तुंग व उदात्त भूमिका वाचकांसमोर आणणारे प्रेरणादायी वाचन साहित्य.
- इतिहास वाचनासाठी पूरक असे संदर्भ पुस्तक.

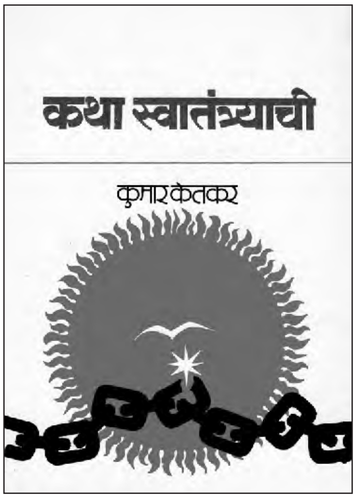

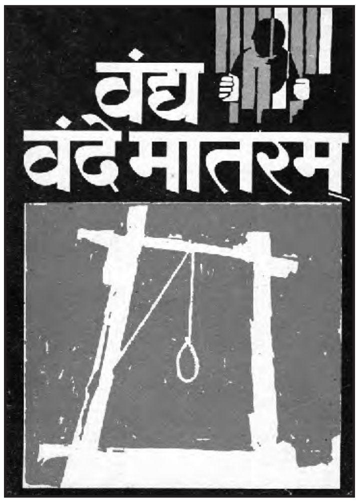

- इतिहास वाचनासाठी पूरक अशी संदर्भ पुस्तके.
- निवडक लेखक, इतिहासकारांचे प्रेरणादायी लेख.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेतस्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পূণে।

इतिहास व नागरिकशास्त्र इ. ७ वी (बंगाली माध्यम)

₹ 40.00